লতা মঞ্জরী

শৈব্যা পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
রবীন বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রীপঞ্চমী, মাঘ ১৩৭১

মুদ্রক ঃ
ফিনিক্স প্রিণ্টার্স
২, চোরবাগান লেন,
কলকাতা ৭০০০০৭

এক

লালি, এই লালি, —

ঝম্, ঝম্, ঝম্। রুপোর মল পায়ে দিয়ে অতি মন্থর গতিতে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল।

দু'হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নিজের চোখ দু'টোকে বার কতক রগড়ে নিয়ে মেয়েটি বলল - কি বলছিস্ ?

— বলছি আর কি, কত বেলা হল উঠবিনি। হাঁস পায়রাগুলো সেই ভোর থেকে বেরুবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। তারপর সংসারে ছিষ্টির কাজ পড়ে। - লালির মা লক্ষ্মী কথাগুলো বলে নিজের কোমরের কাপড়টা ভাল করে জড়িয়ে একগাছা ঝাঁটা নিয়ে প্রাতঃকালীন ঝাঁটপাট শুরু করল।

দু'টো উঠ্‌তি বয়সী সাঁওতালী মেয়ে এসে দাঁড়াল খিড়কি দরজার দিকে। মাথায় তাদের এক বোঝা করে কচি ঘাস। — ঘাস লিবি লা কি গো লালির মা?

ঝাঁটাটা উঠানে ফেলে রেখে লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল খিড়কির দরজায়। কই দেখি কেমন ঘাস। কাল ত অমনি শুকনো ঘাস্‌গুলো দিয়ে গেলি। আমার গরু ত একটাও মুখে করল না।

— আজকে কোচি ঘাস আছেক গো। দেখ্ না কেনে চারটি খাইয়ে। - একটি সাঁওতালী মেয়ে তার মাথার ঘাসের বোঝা থেকে একমুঠো ঘাস টেনে লক্ষ্মীর হাতে দিল।

ঘাস গুলোকে ভালো করে দেখে লক্ষ্মী বলল — কত দিতে হবে ও দু'বোঝায়?

— যা দিস্ তাই দিবি। রোজ রোজ কি তোর সঙ্গে দাম করব নাকি!

— দে তবে। রোজ রোজ আর কাটতে যেতেও পারি না। ওরে ও মা লতা, যা না মা লক্ষ্মীটি — দু'আনা খুচরো পয়সা আমার ভাঁড় থেকে এনে দে না।

লোকজনের সামনে লক্ষ্মী তার মেয়েকে লতা বলেই ডাকে।

লালি তার মায়ের লক্ষ্মীর ভাঁড় থেকে দু'আনা পয়সা এনে সাঁওতাল মেয়ে দু'টোর হাতে দিল।

ওরা পয়সা নিয়ে চলে গেল।

লালি এবার ঝম্ ঝম্ শব্দ করতে করতে এসে তার সখের পায়রার খোপের আবরণ মুক্ত করল। খোলা পেয়ে পায়রাগুলোর কয়েকটা তৎক্ষনাৎ উড়ে এ চালে ও চালে গিয়ে বসল। আর কয়েকটা টংয়ের সামনে পাতা, কাঠখানাতে এসে ঘুরে ঘুরে এক পা তুলে নাচতে লাগল, আর গলা ফুলিয়ে বক্ বকম্ করতে লাগল।

লালি এদের একটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে তার নিজের গালের সঙ্গে চেপে ধরে আদর করল। পরে বার দুই এর ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে চুমু খেল। তারপর হুস্ বলে শূন্যে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে হাততালি দিতে শুরু করল। হাততালির শব্দে সেই পায়রাটা আর কিছুক্ষণ চালে বসল না, শূন্যে উড়তে লাগল। ওর ওড়া দেখে বাকি সব পায়রাগুলোও উড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে ওরা ক্লান্ত হয়ে ওড়া বন্ধ করে ওদের নির্দিষ্ট মাচাঙের উপর গিয়ে ঝাঁকবেঁধে বসল।

লালি এবার এসে তার হাঁসের খোপ খুলে দিল। সাত আটটি দেশী হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দ করতে করতে ঊর্দ্ধশ্বাসে নদীর ঘাটের দিকে ছুটল।

লালি একবার হাঁসের ঘরটা উঁকি মেরে দেখল। - ও মা, আজ তিনটে ডিম পেড়েছে, এই দেখ্।

গরুকে ঘাস কুচিয়ে দিতে দিতে লক্ষ্মী বলল - রেখে দে তুলে, ঝোড়াতে। দেখিস্ সাবধানে রাখিস্। কাল ত রাখতে গিয়ে একটা ভেঙ্গেই ফেল্লি।

ঝম্, ঝম্, ঝম্।

লালি ঘরে গিয়ে ডিম তিনটে রেখে একমুঠো মুসুর ডাল আর একমুঠো ছোলা নিয়ে এসে ডাকতে লাগল - আ - আ - তি - তি- তি- ।

পায়রাগুলো যে যেখানে ছিল, শুনতে পেয়ে ঝট্পট্ নেমে এল।

— বাব্বাঃ, কি রাক্ষুসে ক্ষিদেরে বাবা তোদের। লালি অল্প করে হাতের

ডাল আর ছোলাগুলোকে ছড়াতে লাগল।

একটা পায়রা নতুন এসেছে। সে নামতে ভরসা পাচ্ছে না। টংয়ের উপর বসে বসে কেবলই ঘাড় কাঁপাতে লাগল।

লালি হাতের তালুতে অবশিষ্ট ডালগুলো নিয়ে হাত বাড়িয়ে বার বার ডাকতে লাগল - আঃ - আঃ - তি - তি, তি - তি -

কিন্তু ওর ভয় গেল না।

রাগ করে লালি হাতের ডাল ছোলাগুলোকে আর সবার মাঝে ছড়িয়ে দিল।

লালির পোষা বেড়ালটা কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে বসেছিল। এতগুলো পায়রাতে নিবিষ্ট চিত্তে খেতে দেখে সে নির্ঘাত শিকার ভেবে দলের মধ্যে একটা ঝাঁপ দিল। কিন্তু হায়, বৃথাই ওর ঝাঁপ দেওয়া। ওদের একটাকেও ও ধরতে ত পারলই না, উপরন্তু লালির হাতে এই সকাল বেলা বেশ ক'ঘা চপেটাঘাত খেয়ে মরল। মুখপুড়ী, পায়রা ধরতে এসেছ। বড্ড যে লোভ দেখছি। মর্‌-, মর্‌- আর করবি। যা-বেরো। মারতে মারতে সে তাকে দূর করে দিল।

আহা বেচারি! শিকারও পেল না আবার মারও খেয়ে ম'ল।

লক্ষ্মী বলল - সকালবেলা বেড়ালটাকে মারলি কেন?

— মারবে না, ওর বড্ড লোভ হয়েছে, আমার পায়রার ওপর -

ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌।

লালি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

লক্ষ্মী পিছু পিছু গিয়ে ডাকল - বলি শুনছিস্‌।

— কি? রাগত স্বরে লালি উত্তর দিল।

— যা দেখি, খান কতক কাপড় এই বেলা ঘাট থেকে আছড়ে নিয়ে আয়। ভাঁটিতে কাপড় তৈরী।

— পারব না যা। কেবল তোর ঐ দাসীবাঁদী গিরিই করি আর কি। এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ঢের ভাল। সকাল হ'ল ত যাও পরের কাপড়

ঠেঙ্গাওগে। বলি কাপড় কাচব ত স্কুলের পড়া কখন হবে শুনি — ?

— যা না মা, লক্ষ্মীটি। ওই ত ক'খানা আজ। ও তোর এক্ষুনি হয়ে যাবে। মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে লক্ষ্মী বলল - কাল একটা ভাল শাড়ী এনেছি দেখেছিস্?

— না দেখব না যা।

— দেখবি না ত থাক্। আমিই কেচে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেব বলে ময়লা কাপড়ের স্তূপ থেকে বেছে একখানা সুন্দর শাড়ী বার করল লক্ষ্মী। যেন এখনি সে নিজেই সেটাকে কাচতে যাবে। লালি চোখ ফিরিয়ে তাকাল।

— বাঃ বেশ শাড়ীটা ত! কবে নিয়ে এলি মা, কাল?

— হ্যাঁ।

— দেখি দেখি কাপড়টা। অভিমান ছেড়ে লালি তার মার হাত থেকে শাড়ীটা নিয়ে নিজের কোমরে জড়িয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

সুযোগ বুঝে লক্ষ্মী বলল — কেন, এখন এত লোভ কিসের? থাক না গোসা করে যেমন বসেছিলি। বললাম্ ভাল কথা - তা - না -। যা ওঠ্, পারিস্ ত এটাকেও একটু সাবানে কেচে নিয়ে মাড় দিয়ে দে। আজ কেচে নিলে পাঁচদিন তবু পরা চলবে।

লালি তার পায়ের মল জোড়া খুলে একটা তাকে রেখে দিয়ে বলল - তাড়াতাড়ি দে তবে কি কি দিবি। কিন্তু বেশী পারব না। আজ স্কুলের পড়া না হলে নির্ঘাত মার খেতে হবে এই বুড়ো বয়সে।

লক্ষ্মী কতকগুলো ভাঁটি করা কাপড় আর এক টুকরো সাবান এগিয়ে দিল।

লালি তার নিজের শাড়ীটাকে গাছকোমর করে বেঁধে ভাঁটি করা কাপড় গুলোকে নিয়ে চলল নদীর ঘাটে।

লক্ষ্মী মেয়েকে একটু দেখে মুচকি হাসল।

হঠাৎ ওর চেহারাটার দিকে আজ একটু বেশী করে নজর পড়তে লক্ষ্মী

মনে মনে ভাবল গোবর গাদায় পদ্মফুল। মেয়ের যত বয়েস বাড়ছে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। বলি ছোট জাতের মেয়ের অত রূপের কি দরকার বাপু! মুখপুড়ীর বরাতে বুঝি অশেষ দুর্গতি আছে।

— অল্প বয়সে বাপ গেছে। আমিই আর কত পারি। যা দিন কাল পড়েছে। ক্ষুদ কিনতে নুন ফুরোয়। বলি ধোপার মেয়ে ধোপার মত থাক না। কোথাও কিছু নেই ঘোড়া রোগ। লেখাপড়া শিখব। আরে বাপু গরীবের আবার ও সব কি সখ্। বাপ থাকত সে না হয় সাজত। কিন্তু ওর বয়েসও ত হ'ল। বোধ হয় এই আশ্বিনে চোদ্দয় পা দিল। বাপ থাকলে বিয়ে থার কথা তুলতুম্। কিন্তু আমি একা, এখন পারবই বা কি করে। যা ইচ্ছে করুক্‌গে, মরুক্‌গে। লক্ষ্মী আপন মনে গজ্ গজ্ করতে থাকে।

'হা-ম্বা' করে একটা গরু ডেকে উঠল।

— যাই মা যাই। লক্ষ্মী সরষের তেলের বাটি আর দুধের বালতিটা নিয়ে গিয়ে, বাছুর ছেড়ে দিল। পরে বাছুরের দুধ খাওয়া হলে তাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে গরুর বাঁটে অল্প একটু তেল হাত বুলিয়ে নিয়ে দুধ দুইতে শুরু করল।

লালির আজ খুব আনন্দ।

সুন্দর শাড়ীটা তবু পাঁচটা দিন পরা চলবে। সে তাই মনের আনন্দে গুন গুন করে মাঝে মাঝে গান গাইছে আর নদীর পাড়ে কাঠের পাটাতনে কাপড় আছড়াচ্ছে।

পাটাতনে ভিজে কাপড় আছড়ানর শব্দ হচ্ছে ছপ্ ছপ্ ছপ্।

শীর্ণ এই কোপাই নদী।

অজয়ের শাখা নদী এটি। বর্ষার সময় ছাড়া ওর জল সব সময় এইভাবে একটানা তির তির করে বয়ে চলে। আর তা ছাড়া বর্ষাকালে নদীর জলটা ঘোলাও হয়ে যায়। কাপড় চোপড় কাচা ঠিক মত হয় না। ওই সময়টাই বড় অসুবিধে। বাকী ক'মাস নদীতে স্বচ্ছ জল আয়নার মত ঝক্ ঝক্ করে।

ওপারে চাষীরা মাঠে লাঙল্ দিচ্ছে আর থেকে থেকে বলদ গুলোকে অকারণ ঠেঙাচ্ছে। লালি ক্লান্ত হয়ে জিরোতে জিরোতে একবার দেখল। ওর মনে

কষ্ট হয়, বলদগুলোকে এই অকারণে ঠেঙালে। কিন্তু সে আর কি করতে পারে। বলদগুলোও যেমন অসহায় সেও তেমনি।

বিশ্রাম শেষ করে লালি বাকী কাপড়গুলোকে একবার নেড়ে দেখল আর ক'খানা আছে।

— নাঃ আর মাত্র তিনটে।

লালি উঠে পড়ল। কোমরের কাপড়টাকে একবার ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে আবার একটা কাপড় নিয়ে আছড়াতে শুরু করল। পুনরায় শব্দ হতে লাগল - ছপ্ ছপ্ ছপ্।

দুই

কে ওই ঘাটে স্নান করে?

অমন ফুটন্ত গোলাপের মত রং, — কে ওই মেয়েটি।

ধোপাদের মেয়ে লালি তার কাপড় কাচা সাঙ্গ করে স্নান সারছিল নদীতে। গড়পুরের জমিদারনন্দন দেবব্রত মুখার্জীর সুনজর পড়ল ঐ দিকে।

সদ্য প্যারিস প্রত্যাগত হয়ে সে তার স্টুডিও নিয়ে এই কোপাই নদীর ধারে তাদের নিজস্ব বাগানবাড়ী 'মাধুরী কুঞ্জে' এসে উঠেছে।

কেবল ছবি আঁকা সখ্ সেই ছোট্ট বেলা থেকে। সচল, অচল, জীবন্ত, জড় যে কোন প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এতটুকু নতুনত্ব দেখলেই সে তন্ময় হয়ে যায়। মুগ্ধ নয়নে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চেয়ে থাকে সেই দিকে। রূপ, রস, ভাব, সৌন্দর্য সব কিছু গ্রহণ করা হয়ে গেলে পর, সে তার রঙ আর তুলি নিয়ে শুরু করে রঙের খেলা। এক একবার করে তাকায় উপলক্ষ্যের দিকে আর এক একবার তাকায় তার তুলি বোলাবার কাগজটার দিকে। বাবা রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদ গড়পুর তালুকের জমিদার। একচ্ছত্রাধিপতি। তার দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা তালুক সব সময় তটস্থ হয়ে থাকে। তারই ছেলে এই দেবব্রত। গৌরবর্ণ সুশ্রী দোহারা চেহারা। মাথায় একরাশ কোঁকড়ান চুল। মুখে সবসময় লেগে থাকা মৃদুহাসির আভাষ। ছোট্টবেলা থেকে এর ছবিতে যে কি নেশা তা বলা যায় না। বড় হয়েও সে খেয়ালটা তার গেল না। বরং বাড়ল। বি. এ পাস করার পর অম্বিকা প্রসাদ যখন বললেন এবার বি. এলটা দিয়ে শহরে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস শুরু করগে যাও। তখন সে তার বাবার কথা অমান্য করে বলেছিল - আর আমার ওসব পড়ার ঝোঁক নেই বাবা, আমি এবার ছবি আঁকা শিখব। আমাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে দিন। খেয়ালী

বাবা তখন কি না কি ভেবে তাকে তার ইচ্ছামত কলকাতার আর্টস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। যথা সময়ে দেবব্রত আর্টস্কুল থেকে সম্মানের সঙ্গে পাস করে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বেরিয়েই কি সে ক্ষান্ত হবার ছেলে। তার অতৃপ্ত বাসনা যেন আরও অতৃপ্ত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে তাকে আরও শিখতে হবে। শুধু এ দেশে নয়, পাশ্চাত্ত্য কলাকুশলতাও তাকে গিয়ে শিখে আসতে হবে। সে এবার তার মা মৃন্ময়ীদেবীকে গিয়ে ধরল। — মা, তুমি বাবাকে বলে মত করিয়ে দাও, আমি প্যারিস্ যাব ছবি আঁকা শিখতে।

মৃন্ময়ীদেবী স্বামী অম্বিকা প্রসাদকে গিয়ে ধরলেন — ছেলে ত কিছুতেই শুনবে না। সেই কোথায় প্যারিস না কি, সেখানে যাবে ছবি আঁকা শিখতে। দাও না পাঠিয়ে। যদি সখ্ হয়েই থাকে ঘুরে আসুক।

অম্বিকা প্রসাদ মৃন্ময়ীর কথায় কথা বলেন না বিশেষ। — বেশ ত, যেতে চায় যাক্ না। মোট কত টাকা খরচ হবে আমাকে একটু জানাতে বলো। আমি দেওয়ানকে বলে মাসহারা হিসেবে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

দেবব্রত কাছেই কোথাও দাঁড়িয়েছিল। বাবার কথায় ভরসা পেয়ে ঘরে ঢুকে বলল — তা দু'বছরে হাজার বিশেক টাকা খরচ হবে। অবশ্য মায় যাতায়াত নিয়ে।তবে আমি আশা করি ফিরে এসে এ টাকাটা ঐ ছবি এঁকেই তুলে নিতে পারব।

ছেলের কথা উপেক্ষা করে রায়বাহাদুর বললেন — হ্যাঁ সে আমার জানা আছে। ছবি এঁকে টাকা রোজগার যে কত হবে, সে আর আমাকে শেখাতে হবে না। এটা ত আর তোমার পাশ্চাত্ত্যদেশ নয়, যে লোকেরা শিল্পী এবং শিল্পের দাম আর মর্যাদা দেবে। এটা অন্নবস্ত্র নিপীড়িত দুর্ভাগা বাংলাদেশ, ভারতভূমি। যে দেশের লোক দুবেলা দু'মঠো ভাল করে খেতে পায় না, সে দেশের লোক ঐ ছবি আঁকার পেছনে বিলাসিতা করবে যে কত, তা আর জানতে বাকি নেই। খবর নিয়ে দেখেছ কখনও যে এ দেশের ক'টা শিল্পী তোমার ঐ ছবি এঁকে উদরান্নের সংস্থান করছে। যাও, যাও ও সব আমায় আর শিখিও না।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে অম্বিকা প্রসাদ আবার বললেন — তবে তোমার এবং তোমার মায়ের যখন সখ্ হয়েছে তখন যাও একবার ঘুরে এস। আমিও আপত্তি করব না। তবে জেনে রেখ আমিও আর বেশী দিন নেই। সমস্ত জমিদারীর তদারকির ভার নিতে হবে এই কথা সব সময় স্মরণ রেখে যা খুশী

তাই করতে পার। কইরে কোথা গেলি ভজা —। অম্বিকা প্রসাদ ভৃত্য ভজহরিকে একটা হাঁক দিলেন।

ভজহরি গামছা কাঁধে করে এসে দাঁড়াল।

অম্বিকা প্রসাদ বললেন — সরকার বাবুকে একবার খবর দে, — হ্যাঁ শোন্ দেওয়ান বাবুকেও একবার ডাকবি।

ভজহরি যে আজ্ঞে বলে চলে যাচ্ছিল। অম্বিকা প্রসাদ পুনরায় বললেন — ওরে ও ভজু, — ঘুরে এসে আমার আলবোলার টিকেটা বদলে দিয়ে যা বাবা।

ভজহরি ঘাড় কাত্ করে বেরিয়ে গেল।

দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী ও সরকার হরিশ ভট্টাচার্জ এসে দাঁড়ালেন।

মৃন্ময়ীদেবী সরে গিয়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়ালেন।

অম্বিকা প্রসাদ ওদেরকে দেবব্রতের বিদেশে যাতায়াত বাবদ মাসিক বন্দোবস্তের সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশান্তে বললেন — তা হলে ঐ কথাই রইল। মাসে পাঁচশো করেই পাঠাবেন। আর হ্যাঁ যাবার সময় হাজার দু'য়েক টাকা ওর হাত খরচ হিসেবে এককালীন দিয়ে দেবেন।

— যে আজ্ঞে। বলে ব্রজেনবাবু ও হরিশবাবু একসঙ্গে মাথা নাড়লেন।

সেই দেবব্রত প্যারী প্রত্যাগত।

দু'টি বছর সেখানকার আর্ট কলেজে পড়ে সে নিজেকে তার মনের মত করে তৈরী করে দেশে ফিরেছে।

দেশে ফিরে সে তার স্টুডিওটাকে শহরের ঘিঞ্জি বস্তিতে না করে আপাততঃ তাদেরই এই বাগানবাড়ীর মধ্যেই করেছে। আগে ভাগে অম্বিকা প্রসাদ এই বাগানবাড়ীতে কত বাঈজী কত কি নিয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। যৌবনে এই বাগানবাড়ীকে সুন্দর করে, মনের সমস্ত কল্পনা দিয়েই তখন তৈরী করিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন বার্দ্ধক্য এসে পড়ায় আর ও সব ভাল লাগে না। তাই অসংস্কার অবস্থায় এখন ওটা এমনি ভূতেরবাড়ীর মতই পড়ে আছে। ছেলের যদি ওখানেই থাকবার মন হয় গিয়ে থাক্ না, তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

জমিদারের হুকুমে সাতদিনের মধ্যে বাগানবাড়ী মাধুরীকুঞ্জ আবার নতুন করে রূপ ফিরে পেল। বাগানে নতুন মালী এল, লাগাল নতুন নতুন সিজন ফুলের চারা, গোলাপ, গাঁদা, ডালিয়া আর মালতী, বেল, যুঁই এর ঝাড়। অচিরে সমস্ত বাগানবাড়ী আবার সত্যিই বাগানবাড়ীতে পরিণত হ'ল।

সেদিন দেবব্রত সংবাদ পেয়ে তার ছবি আঁকার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম রঙ তুলির খুঁটিনাটি জিনিস-পত্র নিয়ে এসে উঠল এই বাগানবাড়ীতে। ঘুরে ঘুরে সব বাড়ীটা একবার ভাল করে দেখল। নাঃ মন্দ নয়। ভালই হয়েছে। জানালার একটা সৌখীন পর্দ্দা সরিয়ে সে নদীর দিকটা একবার ভাল করে দেখতে গেল। — বাঃ চমৎকার। শীর্ণরেখা কোপাই নদীর আশপাশটা বাস্তবিকই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। লোভনীয়। তা মন্দ কি এখানে থেকেই কিছু দিন শিল্প সাধনা করা যাক্।

কিন্তু ও কে — ?

কে ওই কেয়াগাছের ওপাশের ঘাটটায় অমন বিবসনা মূর্তিতে আনন্দের সঙ্গে এই এত সকালে জল কেলি করছে। কে ওই মেয়েটি ? কি অপূর্ব ওর মুখশ্রী। কি সুন্দর ওর দেহ লালিমা। কি আশ্চর্য। সে এত দেশ ঘুরে এল, কত জীবন্ত নগ্ন নারী মূর্তির ছবি আঁকল, কিন্তু এমনটি ত সে কোথাও দেখেনি কি অপূর্ব। একি কোন জলদেবী না মানবী। দেবব্রত লালির জল কেলি দেখে তন্ময় হয়ে যায়। সে জানালার পর্দাটাকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে মুগ্ধ নয়নে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

নগ্নই হোক্ আর নাই হোক্, নারীর রূপ দর্শন করতে আর সকলের চক্ষুলজ্জা থাকতে পারে কিন্তু দেবব্রতের এখন তা নেই। পাশ্চাত্ত্য শিল্পশিক্ষা করতে গিয়ে সে নতুন চোখ নিয়ে ফিরেছে। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু অপরূপ তাকে দু'চোখ ভরে আগে দেখ। তারপর তাকে প্রাণ দিয়ে নিজের উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে এসে রঙ তুলি দিয়ে, নানান বর্ণচ্ছটা দিয়ে এঁকে প্রাণবন্ত করে তোল।

প্যারীর লোকেরা সত্যিকার সুন্দরের পূজারী ও সমঝদার। এ দেশের শিল্পীরা মানব দেহকে অতি নিখুঁত করে দেখতে আর আঁকতে জানে। এরা ইংলাণ্ডের শুচিবাই গ্রস্থ লোকেদের মত বা ভারতীয়দের আবৃত চক্ষু সদৃশ নয়। এরা বিবসনা নারীদেহ দেখে অনর্থক লজ্জিত হয় না। এদের যা কিছু সব বাস্তবতাকে নিয়ে, তাই কল্পনার রাণীকে, কল্পনা দিয়ে না এঁকে বাস্তবতার রাণীকে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তিকে ঘরে এনে বিবসনা মূর্তিতে আঁকতে পারে এদের ছবি, তৈরী করতে পারে এদের মডেল। উলঙ্গতাকে নিয়ে এদের মধ্যে আজকাল আর তর্ক বাধে না। ওটা ওদের চোখ সওয়া জিনিস। ওদেশের শিল্পীদের মতে পারফেক্শন্ জিনিসটাই আসল। আর এই কারণেই তারা কল্পনার চেয়ে বাস্তবকে বেশী মূল্য দিয়েছে। অনান্য দেশের শিল্পীদের মত তাই ওরা প্রিয়া আর মায়ের ছবি আঁকবার সময় অনর্থক বস্ত্রের আবরণ চাপিয়ে দেয় না দেহের সর্বত্র।'

দেবব্রত প্রথম প্রথম খুব অসুবিধায় পড়েছিল। ভারতীয় রীতি নীতি

অনুযায়ী ও চোখ তুলে তাকাতে পারত না। এমন কি ঐ পাথরের তৈরী নগ্ন নারীমূর্তিগুলোর দিকেও না।

ক্রমে ক্রমে সে এই প্যারীর দশ বারোটা মিউজিয়ামে গিয়ে গ্রীক্ ভাস্কর্যের শিল্প নৈপুণ্য দেখে চোখ দু'টোকে পাকিয়ে নিয়েছে। তারপর ঐ পাকা চোখ আর অপটু হাত নিয়ে সে venus এর বিখ্যাত শিল্প মন্দিরে ঢুকেছিল ছাত্র হয়ে।

সেই দেবব্রত আজ এই গড়পুরের নিরালা বিলাসকুঞ্জ বাগানবাড়ী 'মাধুরী কুঞ্জে'। লালিকে দেখে যদিও প্রথমটা সংকোচ এসেছিল কিন্তু ওটা ক্ষণিক। সে যে প্যারী প্রত্যাগত একথা তার মনে পড়ে গেল। তাই সে আর অনর্থক জানালার বাইরে থেকে নিজের চোখকে ফিরিয়ে আনল না। প্রাণভরে আজ দেশের এই গ্রাম্য প্রকৃতির সাথে গ্রাম্য রূপসুন্দরী যুবতীর জল কেলি দেখতে লাগল।

বাগানবাড়ীর ভৃত্য বিহারীলাল এসে ডাকল — ছোটবাবু।

— কি রে? ঘুরে দাঁড়াল দেবব্রত।

— চা দোব বাবু ? বিহারী জিজ্ঞাসা করল।

— দিবি ? দে। কিন্তু তার আগে এক কাজ কর দেখি। আমার এই বোর্ড আর স্টাণ্ডটাকে একটু টেনে নিয়ে আয় দেখি এই দিকে।

বিহারী স্টাণ্ডটাকে বোর্ড সমেত আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে এল ওই জানালার ধারটিতে।

— যা তুই এবার, — হ্যাঁ একটু জল দিয়ে যা আমাকে এই পাত্রটাতে। চট্ করে নিয়ে আয়। দেবব্রত বলল।

বিহারী জল আর চা আনতে চলে গেল।

দেবব্রত দ্রুত হস্তে বোর্ডে একখানা ড্রইং পেপার লাগিয়ে পেন্সিলটা খুঁজতে লাগল।

— এই যে পেয়েছি। বলে দেবব্রত এসে দাঁড়াল তার গ্রাম্য শিল্পে সাধনার প্রথম স্থানটিতে। পর্দাটা আরও ভাল করে একটু সরিয়ে দিয়ে সে উঁকি ঝুঁকি মেরে তার ছবির প্রথম উৎসকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় সে! তবে কি সে চলে গেল! দেবব্রত আরও একটু ভাল করে দেখল।

ওই যে চলেছে মেয়েটি, অতি ধীর গতিতে। লীলায়িত ছন্দে তার পা দুটি

বীরভূমের লাল মাটির উপর পড়তে পড়তে চলেছে। কিন্তু ওর কাঁকে একরাশ কাপড়ের বোঝা কেন ? অত কাপড় কি সে এই ঘাট থেকে কেচে নিয়ে গেল! চিন্তান্বিত অন্তরে দেবব্রত অদূরের দিকে ব্যর্থ নয়নে চেয়ে থাকে।

— ছোটবাবু আপনার চা্। আর এই আপনার জল। বিহারী এসে ওগুলো একটা টেবিলে নামাল।

— রেখে দে এখন। চা খেতে ইচ্ছে করছে না। দেবব্রত একটা হতাশার নিশ্বাস ত্যাগ করে নিজের ইজিচেয়ারটায় এসে গা এলিলে দিল।

বিহারী বলল — মা বলে পাঠিয়েছেন তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবেন। রান্না হতে বেশী দেরী হবে না।

— আচ্ছা তুই যা।

বিহারী চলে যাচ্ছিল। দেবব্রত পিছু ডাকল। এই বিহারী শোন্।

বিহারী ঘুরে দাঁড়াল।

— হ্যাঁরে একটা কথা বলছিলাম — একটা ঢোঁক গিলে দেবব্রত কি ভেবে আবার বলল — আচ্ছা তুই এখন যা। পরে বলব।

বিহারী কিছুই যেন বুঝতে পারে নি এমনি ভাবে বোকার মত ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল।

দেবব্রত উঠে দোতলায় থেকে নেমে বাগানে গিয়ে ঢুকল।

মালী ঝারি করে সিজন ফুলের গাছগুলিতে জল দিচ্ছিল। ছোটকর্তাকে দেখে একটা পেন্নাম দিয়ে বলল — সব নতুন গাছই লেগে গেছে বাবু। এই দু'চার দিনেই ফুল হয় আর কি।

— বেশ, বেশ, তুমি এদিকে একটু নজর দিও। দেখ পুরোনো গাছ ক'টা যেন না মরে। কিছু একটা বলা উচিত ভেবে দেবব্রত মালীকে এই কথাগুলো বলল।

বার কতক বাগানের সবুজ ঘাসে ভরা উঠোনটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে পায়চারি করল, তারপর কি যেন একটা হতাশার ব্যঞ্জনা মুখে নিয়ে নিজের ওপরের ঘরটিতে ফিরে এসে একটা কাগজ টেনে নিয়ে কি একটা স্কেচ করতে বসল।

খানিকক্ষণ স্কেচ করার পর কিছুক্ষণ ধরে সে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল নাঃ ঠিক তেমনটি হচ্ছে না। বলে সে তার সদ্য করা স্কেচটি কুণ্ডলী পাকিয়ে

মেঝের এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তিন

সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরে লালি তার বুক থেকে রাশীকৃত বইগুলোকে নামিয়ে রেখে একটা হাঁক দিল — কই গো মা, কোথা গেলি। আমার ক্ষিদে পেয়েছে — শিগ্গীর করে আয়।

লক্ষ্মী ওদিকের দেওয়ালটাতে ক'খানা ঘুঁটে দিচ্ছিল। মেয়ের ডাকে সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে হাত ধুয়ে বাড়ী ফিরল। — ও মা, আজ যে দেখি বড় সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল তোর?

লালি সে কথা কানে না তুলে বলল — দে, দে মা, শিগ্গীর পান্তা দে। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।

লক্ষ্মী রান্নাঘরে ঢুকে লালির জন্য রাখা পান্তা ভাতের সানকিটা সিকে থেকে নামিয়ে ওর কাছে বসিয়ে দিল। — ওমা। একগ্লাস জলও নিয়ে বসিস্নি বুঝি। একটু নুনও নিস্নি। কি হচ্ছিস্ কি দিন দিন?

লালি একটু হেসে আবদারের সুরে বলল — দেনা মা একটু নুন, আমি আর পারছি না। তারপর বিনি নুনে একগাল পান্তা মুখে পুরে বলল — জানিস্ মা, আজ আমি পড়াতেও ফার্ষ্ট হয়েছি আর নাচের ক্লাসেও ফার্ষ্ট হয়েছি।

— ওমা, সে আবার কি কথা রে! তবে কি হবে! বিস্মিত এবং হতচকিত হয়ে লক্ষ্মী গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে মেয়ের দিকে তাকাল।

লালি মায়ের ভাবভঙ্গী দেখে হেসেই খুন। হাস্তে গিয়ে নিজেও সরমে ম'ল। অনেকক্ষণ বাদে ঠাণ্ডা হয়ে বলল — তুই ফার্ষ্ট মানেও বুঝিস্ না বুঝি, -— ফার্ষ্ট মানে প্রথম রে। আমি ক্লাসে আজ প্রথম হয়েছি।

—— ওঃ তাই বল্। পেরথম হয়েছিস্। উ ত বেশ ভাল কথা। তা মাষ্টারনীরা আর কি বললে? মডেল দেবে বললে না?

গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে লালি বলল —— দেবে দেবে তবে এখন নয়। দাঁড়া আগে বড় পরীক্ষায় পাস করি, তখন দেখ্‌বি একটা নয়, দু তিনটে মেডেল নিয়ে আসব।

লক্ষ্মী মেয়ের কথা শুনে আনন্দের সঙ্গে কপালে দুহাত ঠেকিয়ে একবার

তার ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করল। — জয় মা ওলাবিবি, জয় মা নন্দেশ্বরী, -- তোদের দয়ায় মেয়েটা যেন তাই পায়, — তাই পায়।

লালির খাওয়া হয়ে গেল। সে সানকি আর তার জলের গ্লাসটা নিয়ে ধুতে চলে গেল পাশের ডোবাটায়।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে রোজকার নিয়ম মত সে নিজের সাজ সজ্জায় বসল। মাথা বাঁধতে হবে, পায়ে আলতা পরতে হবে। পাঁয়জোর পরতে হবে। কত কাজ। কখন যে সব হবে। — ওমা, দেনা আজ চুলটা বেঁধে। লালি নাকি সুরে আবদার করে তার মাকে ডেকে একটা ভাঙ্গা আয়না নিয়ে বসে চিরুনী দিয়ে চুলের রাশ ফেরাতে লাগল।

লক্ষ্মী বলল — নে না মা তুই নিজে একটু করে। দেখছিস্ ত আমার কত কাজ পড়ে। এখনও গরু তোলা হয় নি। দুধ দোওয়া হয়নি, কখন কি করব বল্ দেখি?

লালি জিদ ধরে বসল। — দিবি না ত ? বেশ তবে আমিও এই বলে দিলাম। তোর কোন কাপড় ইস্ত্রি করতে পারব না। পারিস্ তুই করে নে। আমি আজ সইয়ের বাড়ী বেড়াতে যাব।

লক্ষ্মী ভয় পেয়ে সব কাজ ছেড়ে তাড়াতাড়ি এসে বসল মেয়ের চুল বাঁধতে। — কয় দেখি; শিগ্গীর করে নে। তুই বড় দুষ্টু হচ্ছিস্ লালি দিন দিন। বয়েস বাড়ছে না? বলে সে লালির হাত থেকে চিরুনীটা নিয়ে তার পিছন দিকে বসে চুল বাঁধতে লাগল।

লালি আকাশের দিকে মুখ করা অবস্থায় বলল — উনুনে আগুন দিয়েছিস? আঁচ ধরেছে?

— হ্যাঁ।

— আজ ক'টা কাপড় ইস্ত্রি করতে হবে?

-- বেশী না। সাত খানা। আর দু'খানা শাড়ী।

— আর কিছু নেই?

— না।

— ক'পয়সা পাবি মা আজ?

— জানি না যা। তোর সঙ্গে বকতে পারি না।

— মা চার আনা পয়সা দিবি? কাল স্কুলে নিয়ে গিয়ে কুলপি কিনে খাব। দিবি?

— পয়সা কোথায় পাব রে। আর ও সব খবরদার খাস্ না। অসুখ করে।

— অসুখ করে না ছাই করে। তাহ'লে আর অত লোকে খেত না।

লক্ষ্মী চুপ করল। চুল বাঁধাও তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তার খোঁপাতে রূপোর কাঁটা ক'টা আটকে দিয়ে বলল — যা, যা ইস্ত্রি গরম হয়ে গেছে এতক্ষণ। বেলাও পড়ে এল। আবার সন্ধ্যের পর গিয়ে ওগুলো দিয়ে আসতে হবে ও পাড়ায়।

লালি তার ভাঙ্গা আয়না আর চিরুনীটা হাতে করে নিয়ে উঠে গেল।

খানিক বাদে প্রায় ঘর্মাক্ত কলেবরে ইস্ত্রি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে নদীর ধারটায় গিয়ে দাঁড়াল।

মৃদুমন্দ ঝির ঝিরে বাতাস বইছিল। সেই বাতাসে দাঁড়িয়ে লালি নিজেকে ঠিক করে নিয়ে আবার বাড়ী ঢুকল। মনটা খুব খুসী খুসী দেখাচ্ছে। কি জানি কি ব্যাপার। যা চপলা মেয়ে। আবার হয়ত কি খেয়াল হয়েছে।

ঝম্ ঝম্ ঝম্।

কিছুক্ষণ পরে লালি পায়ে পাঁয়জোর আর গায়ে সকালের সেই লক্ষ্মীর দেখান শাড়ীটা জড়িয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। — ওমা দেখ্ কেমন মানিয়েছে। ঠিক্ যেন কনে বউটি, নারে? বলে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

লক্ষ্মী একবার চোখ ফিরিয়ে মেয়েকে দেখে নিয়ে বলে — কনে বউটি হবারও ত সময় হয়েছে। আর ত সেই কচি খুকিটি নোস্। মেঘে মেঘে কত বয়স্ হল খবর রাখিস্। তোর বাপ থাকলে এদ্দিন তোমাকে ঘরে রাখতুম।

লালি হেসে জিজ্ঞাসা করল — কেন বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতিস্ বুঝি?

ঘাড় নেড়ে লক্ষ্মী বলল — হুঁ করতামই-ত। তোর মত বয়েসে আমি এক ছেলের মা, তা জানিস্। আজ ছেলেটা যদি বাঁচত ত ওই মোতিলালের মতই — অত বড়টা হোত।

মুখটাকে ঘুরিয়ে লালি বলল — তোকে যে কি মতিলালে পেয়ে বসে

আছে তুই জানিস্। আমার কিন্তু ভাললাগে না মা। তুই ওটাকে এখানে আসতে মানা করে দিস্। আমার দিকে যা করে তাকায় মরণ আর কি।

— মরণ কি রে। তোর কি ওকে পছন্দ হয় না, নাকি?

— কেন? পছন্দ হলে তোর কি লাভ, যে আমার শুধু মুধু যাকে তাকে পছন্দ হতে যাবে।

— সেকিরে, ও যে মোতিলালের বাবাকে বলে গেছে।

— ইস্, আমার বয়ে গেছে ওকে বিয়ে করতে। বাবা কথা দিয়েছে বাবা দিয়েছে; আমি কথা দিলে তবে ত। তাছাড়া আমি বিয়ে করবই না। আমি আরও পড়ব, আরও নাচ শিখব। আমি সিনেমা করতে যাব ক'লকাতায়।

— কি বললি? লক্ষ্মী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল।

— বলছি আমি বিয়ে করব না, তোর ঐ মতিলালকে। হয়েছে। ঝম্ ঝম্ ঝম্।

লালি আর কোন কথার উত্তর না দিয়ে উঠোনের ওদিকটায় গিয়ে পায়রা গুলোকে ডাকতে লাগল — আয়, আয়, তি — তি, তি — তি। আয় আয় ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

লালির এক ডাকে তার বশ্য পায়রার দল চাল থেকে এসে টঙে ঢুকল।

বক্ বকম্ কম্। বক্ বকম্ কম্।

টঙে ঢুকে মদ্দা পায়রাগুলো মাদীগুলোকে ঘিরে ঘিরে গলা ফুলিয়ে ডাকতে লাগল।

সব পায়রা ঢুকলে পর লালি তাদের চালা বন্ধ করে দিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে হাঁস গুলোকে ডাকতে লাগল — আঃ আঃ, চই চই, চই চই —।

হাঁসগুলো সব লালির সাড়া পেয়ে যে যেখানে ছিল ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল।

লালি এদের ও ঠিকভাবে বন্ধ করে ঘরে গিয়ে প্রদীপ, তেল সলতে আর লণ্ঠনটা নিয়ে বসল। তার মায়ের যদি কোন একটু আক্কেল বুদ্ধি কিছু থাকে। লণ্ঠনের কাঁচটাও পরিষ্কার করা নেই। তেলও ভরা নেই। সে ক্ষুব্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল — আমি এখন কেরোসিন হাত করতে পারব না যা। তেল ভরে দে শিগ্‌গীর

লণ্ঠনে। রাত হ'ল পড়তে বসতে হবে।

লক্ষ্মী এসে লণ্ঠনে কেরোসিন ভর্তি করে দিয়ে কাঁচটাও পরিষ্কার করে দিয়ে চলে গেল।

লালি প্রদীপে তেল দিয়ে সেটা জ্বেলে নিত্যকার নিয়ম মত তুলসী তলায় এসে সন্ধ্যা দেখাল। গড় হয়ে প্রণাম সেরে তিনবার শাঁখে ফুঁ দিল। তারে পর শাঁখটাকে জলদিয়ে ধুয়ে যথাস্থানে রেখে সে লণ্ঠন জ্বাল্ল।

— মা?

— কি রে?

— আমি তবে পড়তে যাচ্ছি ঘরে। তুই তাড়াতাড়ি আয়। নইলে আমার ভয় লাগবে।

— তুই যা না, আমি এই এলাম বলে। ঘাটে গিয়ে কাপড়টা কাচব আর আসব। লক্ষ্মী বলল।

লালি লণ্ঠন নিয়ে এ ঘর থেকে উঠোন পেরিয়ে ও ঘরে যাবার পথে কি দেখে থমকে দাঁড়াল।

— মা শোন্।

— কি আবার?

— বাবুদের বাগানবাড়ীর ছাদে অত আলো কিসের রে? — লালি জিজ্ঞাসা করল।

— কি জানি বাপু! হয়ত ছোট খোকাবাবু বিলেত থেকে ফিরেছে ওখানে। মোতির মা ত তাই বলছিল। সে জন্যেই নাকি মিস্ত্রী খাটছে, অত ঘরে রঙ হচ্ছে, কত কি কাজ হচ্ছে।

— কে ছোটখোকাবাবু? সেই ফর্সা করে বাবুটা? যে ছবি আঁকা শিখতে বিলেত গেছিল।

— হ্যাঁরে হ্যাঁ। কর্তাবাবুর বড় ছেলে দেববাবু। নাঃ যাই দেরী হয়ে গেল। বলে লক্ষ্মী চলে গেল ঘাটের দিকে।

লালিও লণ্ঠনটা নিয়ে নিজের পড়ার ঘরে এসে বসল। দেববাবু, বেশ নামটি কিন্তু। লালির মনে ঐ নামটা হঠাৎ বার বার চলাফেরা করতে লাগল। কি

জানি কি ভেবে সে আবার লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ঘরের নীচে উঠোনের কাছে এসে একবার দাঁড়িয়ে বাগানবাড়ীটার দিকে তাকাল।

সত্যিই দেবব্রতর ঘরটিতে একটি পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল। তার উজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটা জানালার পথে বেরিয়ে এসে পল্লীগ্রামের ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশটুকুকে বেশ আলোকিত করে তুলেছে।

লালি কি জানি কি দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল ঘরের সেই উজ্জ্বল আলোর মধ্যে একটি ছায়ামূর্তি একবার এদিকে আসছে আবার পরক্ষণেই দূরে সরে গিয়ে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। লালির গাটা ছম্ ছম্ করে উঠল। কিন্তু ওটাকে মানুষের ছায়া বলেই ত মনে হচ্ছে। তবে কে ঐ ঘরে! তবে কি সেই দেববাবুই এসেছেন ঐ ঘরে। কে জানে। আর যেই আসুক্। তার কি যায় আসে। আদার ব্যাপারীর অত জাহাজের খোঁজে লাভ কি। নাঃ যাই পড়িগে। কিন্তু মা-টাও ত এখনও ফিরছে না। না এলে কি পড়াতে মন বসবে। দূর ছাই।

লালি নদীর ধারের জানালাটায় গিয়ে কাঠের গরাদেতে মাথা রেখে তার মাকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করল।

— ওমা তুই ওখানে কি করছিস্ দাঁড়িয়ে? লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল।

লালি শান্ত হয়ে তার বইগুলোকে লণ্ঠনের কাছে টেনে এনে বলল — এত দেরী করিস্ কেন বল্‌তো? আমার বুঝি ভয় লাগে না, না? কাল থেকে বেলা থাকতে গা ধুয়ে আসবি।

লক্ষ্মী হাসল।

লালি তার বাংলা পাঠ্য পুস্তকটাকে খুলে একটা পদ্য মুখস্থ করতে শুরু করল।

চার

পরদিন সকালে।

দেবব্রত বোর্ডে ড্রইং পেপার এঁটে হাতে স্কেচিং পেনসিল নিয়ে নদীর দিকের জানালাটা খুলে অপেক্ষা করছে, আজও যদি একবার আসে সেই মেয়েটি।

বেলা বাড়ে।

দেবব্রত অধীর আগ্রহে আশাপথ চেয়ে বসে থাকে সেই রূপসুন্দরীর প্রতীক্ষায়।

কিন্তু নাঃ, সে বুঝি আর এল না। তাই ত, রোজই বা সে আসবে কেন। তাছাড়া এ তাকে কী খামখেয়ালীতে পেয়ে বসেছে কে জানে। কত রূপসী, কত অনন্যা বিদ্যাসুন্দরীদেরই ত সে দেখল, কিন্তু এই গ্রাম্য বালিকাকে দেখে এ তার কি খেয়াল বুঝি না। দেবব্রতের মনে হয় এত সৌন্দর্য বুঝি সে সত্যই আজ পর্যন্ত কোথাও দেখেনি। তাকে কি তার রং তুলির বর্ণ-বৈচিত্র্যের ধরা ছোঁয়ায় না নিয়ে এলে চলে। চেষ্টা তাকে করতেই হবে। কাছে পাওয়া হয়ত সহজ হবেনা কিন্তু দূর থেকে দেখতে ত কোন দোষ নেই। ঐ দূর থেকে দেখেই সে তাকে তার স্কেচের মধ্যে নিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে তার সম্পূর্ণ সত্বার মধ্যে। যতটুকু ভূলত্রুটী ভগবানও করেছেন ওর দিক থেকে সেটুকুকেও সে সংশোধিত করে এক অনিন্দ্য সুন্দর গ্রাম্য যুবতীর প্রতিবিম্ব তৈরী করবে।

হঠাৎ দেবব্রতের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

— কে আসে ওই রাঙাপথ বাহিয়া।

ওই কি সেই নয়?

দেবব্রত উঠে দাঁড়ায়। হাতে বায়নাকুলারটা নিয়ে একবার চোখে লাগিয়ে ভাল করে দেখে। হ্যাঁ এইত সেই মেয়ে।

সত্যই লালি আস্‌ছিল নদীর ঘাটে। তার নিত্য নৈমিত্তিক কর্তব্য কিছু কাপড় কাচার জন্য আর নিজের স্নানের জন্য। মাথায় তার কাপড়ের একটা ছোটখাটো পোঁটলা। ঘাটে এসে সে পোঁটলা খুলে জলে গিয়ে নামল।

দেবব্রত পর্দার কাপড়টাকে ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে বায়নাকুলার নিয়ে দেখতে থাকে। একি! ওযে রীতিমত ধোপানীদের মত কাঠের পাটাতনে কাপড় কাচতে শুরু করল। তবে কি —? দেবব্রতের মনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু জাতের প্রশ্ন এখানে ওঠেনা। ও ধোপানীই হোক্ আর যাই হোক্, — ও অপরূপা — এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ বায়নাকুলারের মাধ্যমে ওকে দেখা যাচ্ছে — যেন অতি সন্নিকটে। বোধ করি হাত দুয়েক তফাতেও নয়। কি সুন্দর ওর মুখশ্রী, কি অপূর্বই ভ্রূদু'খানি। অপূর্বই। সত্যই অপূর্ব। কিন্তু কখন ওর এই কাপড় ঠেঙ্গান শেষ হবে! কখন সে তাকে তার মনোমত ভঙ্গী ও পরিবেশের মধ্যে পাবে। এক ঘন্টা অতীত হয়ে গেল, তবু ওর কাজ শেষ হয় না। দেবব্রতের কষ্ট হয়। আহা বেচারী। ওই অতটুকু বয়সে কি পরিশ্রমই না করতে হচ্ছে। হয়ত ওরা খুব দুঃস্থ, আর তা যদি নাই হবে তবে ওভাবে এত কষ্ট করতে যাবে কেন। কিন্তু কি-ই বা করতে পারে সে নিজে।

যা দরিদ্রদেশ। তবু একটু খবর নেওয়া দরকার। যখন এই পাশেই বাড়ী নিশ্চয়ই ওরা আমাদেরই প্রজা হবে। বিহারীকে দিয়ে একটু খবর নিতে হয়।

লালির কাপড় কাচা শেষ হ'ল।

নিঙড়ান কাপড়গুলোকে সে অতঃপর একে একে ঘাসের উপর, শুকনো আগাছার উপর ভাল করে মেলে শুকাতে দিল।

লালি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করেছে। একটু না বসলে কোমরটা যেন কেমন করছে। সে একটা গাছের ছায়ার তলায় ভাল করে বসল। ক্লান্তি অবসানের পূর্ণ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে তার আঁচল দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিল। তারপর এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে জমিদারের ঐ বাগানবাড়ীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। কি সুন্দর রঙ করেছে বাড়ীটার। বাড়ীটাকেও বেশ দেখতে। ওপরে ছাদের কার্নিসে বসান টবগুলোতে কি যেন সব ফুল ফুটেছে। বোধ হয় ডালিয়াই হবে। নীচের বাগানেও প্রচুর গাঁদা ফুটেছে। লালির ভারী লোভ হল। একদিন গিয়ে সে বাগানের মালীর কাছ থেকে চারটি ফুল চেয়ে আনবে। কিন্তু যদি না দেয় ! আর সে চাইতেই বা যাবে কেন? ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। দূর ছাই, কেন যে মরতে বড়লোক হয়ে জন্মালুম না। বেশ হোত তাহলে। কত বড় বাড়ী ঘর দোর, কত জিনিসপত্র গহনা কত কি পাওয়া যেত। আর তাহলে কি এমনি গাধার খাটুনি খেটে মরতে হোত। কেমন বসে বসে আদর যত্ন পেতাম আর বাপ মায়ের আদরের দুলালী হয়ে বেড়াতে পারতাম। লালি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। নাঃ এবার মরে নিশ্চয়ই সে বড়লোক হয়ে জন্ম নেবে। কিন্তু আর ত দেরী করা চলে না। যাই স্নানটা সেরে ফেলি। আবার স্কুল যেতে না হলে দেরী হয়ে যাবে।

লালি উঠে দাঁড়াল।

আ হা - হা -। আর একটু, যাঃ — সব নষ্ট হয়ে গেল। দূর ছাই মেয়েটার কি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। আর একটু বসে জিরোতে পারল না। আর ক'টা মিনিট বসলে কি ক্ষতিটা ওর হোত। দেবব্রত হতাশার নিশ্বাস ত্যাগ করে বায়নাকুলারটা আবার চোখে দিয়ে নদীর দিকে মুখ করে বসল। বোর্ডটাকে একটু ঘুরিয়ে সামনে আনল। তাতে নতুন কাগজ আঁটল।

লালি স্নান করছে।

একটার পর একটা ডুব দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে নিজেকে জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে পায়ে করে নদীর জল আলোড়িত করছে।

দেবব্রত অস্থির পদে একবার ঘরময় পায়চারি করে আবার এসে দাঁড়াল

সেই আগের জায়গাটিতে। কি চঞ্চলা মেয়েরে বাবা। একটু কি স্থির থাকতে নেই ওকে। ওকি! ও চলল কোথা অমন সাঁতার কেটে। দেখছি মেয়েটা সাঁতারেও পটু।

লালি কখনও ডুব সাঁতার কখনও ভাসা সাঁতার কেটে ওপারের চড়ায় গিয়ে উঠল। তার হাঁসগুলো সব ওপারের ডাঙ্গায় উঠে রোদ পোয়াচ্ছিল আর পালক পরিষ্কার করছিল যে যার ঠোঁট দিয়ে। কোনটা বা একপায়ে দাঁড়িয়ে নিজের ডানার মধ্যে ঠোঁট গুঁজে সুখে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল।

লালি আচম্‌কা গিয়ে তাদের একটাকে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরে একবার আদর করে হুস করে নদীর জলে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর সব হাঁস গুলো প্যাঁক্‌প্যাঁক্‌ শব্দ করতে করতে পূর্ববর্তী হাঁসটিকে অনুসরণ করল।

লালি আবার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এপারে এসে সে এবার একজায়গায় দাঁড়িয়ে নদীর তটের আশ পাশটা একটু নজর করে দেখে নিলে। তারপর এক কোমর জলে গিয়ে নিজের গায়ের কাপড়টা খুলে ফেলে একটা গামছা দিয়ে গা হাত বেশ্‌ করে মাজতে লাগল।

দেবব্রত আবার বসেছে হাতে পেন্‌সিল নিয়ে। গতকাল যা সে একবার চকিতভাবে দেখেছে আজ সে তা পূর্ণদৃষ্টিতে ভাল দেখল। কাগজে পেন্সিলের আঁচড় পড়ছে তড়িৎ গতিতে। সে তার হাতকে আরও দ্রুত চলার জন্য আদেশ করল। আরও — আরও দ্রুত হাত, আরও দ্রুত চল।

লালি গা মোছা শেষ করে একটা ডুব দিল আবার। তারপর গামছাটাকে ভাল করে নিঙড়ে নিয়ে বেশ করে চেপে তার গা মাথা হাত মুছতে লাগল।

দেবব্রতেরও শেষ হয়ে গেছে। এবারের স্কেচখানি বেশ ভালই হয়েছে। সে স্কেচ শেষ করে আবার একবার বায়নাকুলারটা চোখে লাগিয়ে একবার লালিকে আর একবার তার স্কেচটিকে দেখতে লাগল। হ্যাঁ ঠিক্‌, ঠিক্‌ হয়েছে। পূর্ণ আনন্দে ও নূতন কিছু আঁকার গৌরবে দেবব্রত খুশী হয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

লালির গা মোছা শেষ হ'তে জলের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাপড়ের একটা প্রান্তকে জলের মধ্যে কোমরে বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে ওপর প্রান্তটাকে একবার কেচে নিল। তারপর কাপড়টাকে নিঙড়ে অনাবৃত দেহবল্লরীকে যত্নের সঙ্গে ঢাকা দিল।

দেবব্রতের আনন্দ আর ধরে না। অসামান্য রূপসীর মূর্তিমন্ত ছবির একখানি স্কেচ সে এভাবে করতে সক্ষম হয়েছে। সে খুশী মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা হাঁক দিল — বিহারী — এই বিহারী — কোথায় গেলিরে। একটু চা-

টা, কই দিয়ে যা।

— যাই বাবু। বিহারী সাড়া দিল।

সিগারেটে মস্ত একটা টান দিয়ে দেবব্রত পশ্চিম দিকের জানালাতে এসে দাঁড়াল।

লালি ভিজে কাপড়ে চলেছে বাড়ীর দিকে। সমস্ত কাপড়খানি লালির দেহলতাকে জড়িয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। দেবব্রতের হঠাৎ মনে হ'ল ললিত ভঙ্গিমায় শ্রীরাধিকা যেন যমুনা থেকে স্নান সেরে তার বিলাস কুঞ্জের দিকে চলেছে। কিন্তু ওকি! ওযে এই বাগানবাড়ীর দিকেই আসছে। তবে কি সে তার এই গোপন ছবি আঁকার জন্য প্রতিবাদ করতে আসছে। — না, না, — তা হতেই পারে না।

বিহারী চা এনে দেবব্রতের ড্রইং টেব্‌লে রাখল।

দেবব্রতের সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে নীচের বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে।

লালি এসে বাগানে ঢুকল।

চারিদিকটা একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল নানান্‌ জাতীয় ফুল ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। মালীটাও ত নেই, তবে সে কি করে এই পুষ্পচয়ন করবে। কাউকে না বলে জিনিস নিলে চুরি করা হয়। তা সে পারবে না। যাক্‌ আর একদিন আসব। আজ না হয় নাই বা পেলাম।

মালী কোথায় গিয়েছিল। লালিকে ফিরতে দেখে দেবব্রত দ্রুত পদে নীচে নেমে এসে বলল — দাঁড়াও।

কি গম্ভীর স্বর।

লালি শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

একি! কে এই অপূর্ব সুন্দর বাবুটি! লালি মুগ্ধের মত চেয়ে থাকে।

দেবব্রতও তন্ময় হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে লালির দিকে।

রূপসুধা পান করে দু'জনে দু'জনার।

কতক্ষণ দু'জনারই বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

হঠাৎ লালির চমক ভাঙ্গল। সে চোখ নামিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। কি জন্য সে এখানে এসেছিল তা বুঝি মুহূর্তে ভুলে গেল। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে এই মুহূর্তে।

দেবব্রত আবার বলল — দাঁড়াও।

লালি ফিরে তাকাল। লজ্জা এসে নেমেছে তার আনত চোখে। একি করল সে। কেন মরতে সে এখানে এল। সর্বাঙ্গে তার ভিজা কাপড়, তাছাড়া বাবুটির চোখে যেন কেমন ধারা চাহনি।

— কি চাই তোমার ? দেবব্রত একটু সরে এসে জিজ্ঞাসা করল।

শুধু ঘাড় নেড়ে লালি জানাল — কিছু না।

— কিছু না, তবে এমনি এসেছ এখানে? উহুঁ। দেবব্রত মৃদু হাসল। বলল — আমি জানি তুমি কেন এসেছ এখানে। তোমার কিছু ফুল চাই, তাই না? ঘাড় হেঁট করে বুকের কাছে হাত রেখে লালি সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না।

— তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমায় ফুল তুলে দিই। দেবব্রত নিজে হাতেই নানান্ গাছ থেকে নানান্ ফুল তুলে এনে বলল-ধরো। কিসে নেবে?

লালি বলল — অত ফুল আমার চাই না। চারটে হলেই হয়ে যাবে।

— যাক্ যখন তোলা হয়ে গেছে নিয়ে যাও। কাজে লাগবে। আমার বাগানে অনেক আছে এখনও। নাও ধরো।

লালি হাত পাতল।

— উহুঁ, ও ছোট্ট হাত দিয়ে আঁটবে না। আঁচল পাত।

লজ্জায় মরে গিয়েও লালি তার ভিজে আঁচল খানি কোনরকমে অল্প খুলে ধরল।

দেবব্রত তার আঁচল ভর্তি করে ফুল দিল।

দেবার সময় অঙ্গস্পর্শ হ'ল। দু'জনারই শরীরে কেমন যেন পুলক শিহরণ খেলে গেল।

একটা কৃতজ্ঞতা সূচক কথাও না বলে লালি ফিরে চলল।

— দেবব্রত বলল — দরকার হ'লে যখন খুশী এসে ফুল নিয়ে যেও। আমি মালীকে বলে রাখব।

লালি শুনতে পেয়েও কোন কথার উত্তর দিলনা। ত্রস্ত পদে সে বাড়ীর দিকে ছুটে চলল।

দেবব্রত অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইল তার দিকে। মুখে মৃদু হাসি, মনে আনন্দের প্রাণবন্যা। আজকার মত খুশী বুঝি সে জীবনে আর কখনও হয়নি।

লালি অদৃশ্য হয়ে গেল অদূরের ঐ গাছটার আড়ালে।

বিহারী বাগানের মাঠে আর এককাপ চা করে এনে দাঁড়িয়েছিল। দেবব্রত ঘুরতেই সে বলল — বাবু আপনার চা।

দেবব্রত একটু লজ্জিত হয়ে বলল — ওঃ, চা, না? আচ্ছা দে।

দেবব্রত বাগানে দাঁড়িয়েই চা পান শেষ করে বিহারীর হাতে পেয়ালাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল — হ্যাঁরে বিহারী, — ওই মেয়েটি কে রে?

বিহারী মৃদু হেসে বলল — আপনাদের প্রজা হয় বাবু।

— তা না হয় হল। কিন্তু পরিচয় কি ওর। কাদের মেয়ে, কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নিশ্চয়ই, — না?

— না বাবু, ও আমাদের ধোপা রামলালের মেয়ে।

— কি বললি? ধোপার মেয়ে।

— হ্যাঁ বাবু। ওর বাপ মারা গেছে। তবু ওর মা আর ওই মেয়েটাই কোন রকমে কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছে নিজেদের জাত ব্যবসা করে।

দেবব্রতকে একটু চিন্তাগ্রস্ত দেখাতে লাগল।

বিহারী বলে চলল — মেয়েটা কিন্তু বাবু খুব লক্ষ্মী। ওই অতরূপ নিয়ে আছে বটে কিন্তু বড় সৎ। আর কি পরিশ্রমী বাবু, সে নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ওর মা আর কি করে, ওই ত যত কাপড় চোপড় কাচে, শুকোতে দেয়, ইস্ত্রি করে। তারপর আবার নিজে স্কুলেও যায়।

— স্কুলে পড়ে নাকি মেয়েটা?

— হ্যাঁ বাবু পড়ে নয় শুধু, স্কুলে ফার্স্ট হয়। তারপর নাচও শেখে। আবার সংসারের এত কাজ কর্ম সেদিকেও লক্ষ্য রাখে।

— কোন ক্লাসে পড়ে রে ও? জিজ্ঞাসা করল দেবব্রত।

— তা ত জানি না বাবু। তবে শুনেছি শিগ্‌গীর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

— ওঃ আচ্ছা তুই যা।

বিহারী অল্পক্ষণ আরও দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।

দেবব্রত বাগানের কচিঘাসে ভরা উঠানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

পাঁচ

লালিকে যেন হঠাৎ কিসে পেয়ে বসেছে।

মুখে কথা নেই, সেই হাসি নেই, চপলতা নেই, দেখে যেন চেনাই যায় না এ সেই মেয়ে।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল — হ্যাঁ রে তোর হোলটা কি বলত? কোন অসুখ-বিসুখ করে নি ত?

লক্ষ্মী ম্লান হেসে বলল — না গো মা না, ও কিছু নয়। কেমন যেন কিছু ভাল লাগছে না ক'দিন।

— আমি বলি কি একবার তোর ডাক্তারকাকাকে ডেকে দি-ই একটু দেখুক। আবার না না কেন — লজ্জা কিসের?

লালি তবুও না, না করতে লাগল। অসুখ করেনি বলছি ত তোকে।

— তবে অমন মন মরা হয়ে থাকিস্ কেন শুনি? লক্ষ্মী অনুযোগের ভঙ্গীতে বলল।

— কই গো কাকী, কোথায় গেলি সব, এই দেখ কে এসেছে। বলতে বলতে স্বর্গত রামলালের বন্ধু পিয়ারী লালের ছেলে মতিলাল এসে হাজির হ'ল।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি একটা চাটাই পেতে বসতে দিল রোয়াকে। — আয় বাবা বোস। তারপর কবে এলি? সব ভাল ত? কাজ-কর্ম কেমন হচ্ছে?

মতিলাল চাটাইয়ে বসে বলতে লাগল — সব ভাল কাকী, সব ভাল ভগবানের দয়ায়। চাকরীর অবস্থা মন্দ নয়। সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে তা হাতে এখন কিছু থাকছে বলা চলে। তারপর তোরা সব কে কেমন আছিস বল। লালি কোথায় গো কাকী, তাকে ত দেখছি না। মতিলাল ঘরের এ পাশ ও পাশে একবার সন্ধানী চোখ মেলল।

লক্ষ্মী ডাকল — এই লালি। ঘরের ভেতরে বসে রইলি যে বড় — বাইরে আয়। মোতিলাল কতদিন পরে দেশে ফিরল। তার সঙ্গে দুটো কথা বল এসে।

হাজার হোক্ ও তোর বাবার বন্ধুর ছেলে। আজই না হয় ও ক'টা বছর দেশে ছিল না। নইলে ত সারাটা দিন এ পাড়াতে আর এ বাড়ীতেই কাটিয়েছে। এর মধ্যে সব ভুলে গেলি নাকি। কইরে লালি —

লক্ষ্মীর তাগিদে লালি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ও পাশে চাটাইয়ের এক কোনে বসে হাতের নখ দিয়ে চাটাইটাকে খুঁটতে লাগল মুখ নীচু করে।

মতিলাল সহাস্যবদনে বলল — কিরে তুই যে বড় গম্ভীর মেরে গেছিস দেখছি। আর সে হাসি দেখছি না — কি ব্যাপার? তারপর কোন ক্লাস হ'চ্ছে এ বছর?

লালি বলল — ক্লাস নাইন।

— বেশ। তারপর আর নাচ্-টাচ্ কিছু শিখলি?

লালি মুখ নীচু করে থাকে। সে জানে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া মানেই তাকে একদিন নেচে দেখাতে হবে।

মতিলালও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বললে — স্কুলে যাস্ ত, নাচের ক্লাসে?

লালি সত্য কথা স্বীকার করে বলল — হুঁ যাই।

— যাক্ খুব ভাল কথা। আচ্ছা কাকী এখন তবে আমি উঠি, আর একদিন আসব'খন। ওরে লালি একদিন এসে তোর নাচ দেখব। জানিস্। কেমন সব শিখলি একটু দেখাস্।

লক্ষ্মী বলল — সে কি বাবা, এরি মধ্যি উঠবি।

একটু বোস্, এক গেলাস চা করে দিই খেয়ে যা। আর তাছাড়া কিই বা দোব খেতে। তবে ঘরে গরম মুড়ি আর গুড়ছোলা আছে, কাল করেছি, খাবি দুটি?

— না কাকী, আজ থাক্ আর একদিন এসে খাব। ওঃ তোর বুঝি দুঃখ হচ্ছে। আচ্ছা দে তবে। তোর গুড়ছোলাই কেমন হয়েছে চেকে দেখি। কিন্তু ও সব মুড়ি টুড়ি এখন থাক।

লক্ষ্মী উঠে গিয়ে খানিকটা গুড়ছোলা এনে দিল।

মতিলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিবুতে লাগল।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল — তোদের নাচের দল এবার কতদূর গিয়েছিল রে

মোতিলাল? কেমন রোজগার হ'ল। একটু বল শুনি।

মতিলাল বলে — ওঃ সে সব অনেক কথা কাকী। একদিনে কি আর বলা যাবে। তবে এবার আমরা সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরছি। প্রায় একমাসের ওপর আমরা সেখানে ছিলাম আমাদের দলবল নিয়ে।

ওখানকার সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্ক আর রাজধানী ওয়াশিংটনের চমৎকার চমৎকার প্রেক্ষাগৃহে আমরা পর পর পনের পনের দিন ধরে আমাদের ভারতীয় নৃত্যনাট্যকলা দেখিয়েছি। ওরা ত আমাদের ভারতীয় নৃত্য সংস্কৃতি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। শুধু শো দেখা ছাড়া তারা যে কত মেডেল, পুরস্কার বিভিন্ন জনকে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

লালি মুখ তুলে একবার তাকাল। হয়ত সে জানতে চাইল। সে নিজে কিছু পেয়েছে কিনা।

মতিলাল তৎক্ষনাৎ তার পকেটে হাত ভরিয়ে দুটো সোনার মেডেল বার করে দেখাল। বলল — একটা দিয়েছে আমাকে ওখানকার একজন ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আর এটা দিয়েছে ওখানকার প্রেসিডেন্টের মেয়ে। কি খুশিই না হয়েছিল আমার রাধাকৃষ্ণের নাচ দেখে।

লক্ষ্মী মেডেল দুটো মতিলালের হাত থেকে নিয়ে একবার দেখল। বলল — ভারী চমৎকার কিন্তু।

লালি তার মায়ের কাছে সরে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখল। তারপর হঠাৎ নিজেই একবার জিজ্ঞাসা করে ফেলল — আর কিছু পাও নি?

— না আর কিছু পাই নি। কি মেডেল দেখে যে খুব লোভ লাগছে দেখি। নিবি নাকি একটা? মতিলাল জিজ্ঞাসা করল লালিকে।

লালি সলজ্জ হেসে মুখ নামিয়ে আবার নখ দিয়ে তালপাতার বোনা চাটাইটা খুঁটতে লাগল।

মতিলাল বলল — আচ্ছা দেখি তোর নাচটা আগে, কেমন ধারা শিখলি — তারপর যদি বিবেচনা করি, তোকে একটা দোব। অবশ্য যদি বাস্তবিক আমার ভাল লাগে। কি নাচ দেখাবি ত?

লক্ষ্মী আর মতিলাল দুজনেই চেয়ে রইল লালির আনত মুখের দিকে।

লালি হ্যাঁ না কোন কথাই বলল না।

মতিলাল লক্ষ্মীর হাত থেকে মেডেল দুটো নিয়ে বলল — আচ্ছা কাকী

আমি এখন চলি —। পারিত ও বেলা আসব। আর সেই সঙ্গে লালির নাচটাও দেখে যাব। কিরে বুঝেছিস্, — ভাল করে নাচতে হবে কিন্তু না হলে আর মেডেল পাচ্ছনা। আজ ত রবিবার স্কুল নেই। দুপুরে একটু নিজে নিজে তালিম দিয়ে রাখিস্। ওস্তাদের কাছে নাচ খারাপ হলে কি হবে জানিস্। মার খেতে হবে। আচ্ছা চলি।

দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল — হ্যাঁরে বাড়ীতে তবলা আছে ত? কাকার যেন বাঁয়া তবলা এক জোড়া ছিল বলে মনে হচ্ছে। আছে ত সে দুটো, নাকি?

লক্ষ্মীই বলল — আছে ত জানি। তবে সে কি আর বাজবে। কদ্দিন ব্যবহার না হয়ে এমনি পড়ে আছে, নষ্ট হয়েই গেছে কি না কে জানে।

— কই দেখি কোথা আছে। মতিলাল বলল।

লক্ষ্মী উঠে তাকে পাশের ঘরটায় নিয়ে গেল। বলল ঐ মাচাঙের ওপর আছে। হাত যাবে না আমার। দেখ্ দেখি হাত বাড়িয়ে, নইলে মই আনি।

মতিলাল হাত বাড়িয়ে কোন রকমে বাঁয়া তবলা জোড়াটা পাড়ল। ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে একবার ভাল করে চারিদিকটা লক্ষ্য করে দুটোতে চাটি মেরে বারকতক পরীক্ষা করল। — নাঃ ভালই আছে, কাজ চলে যাবে। আচ্ছা কাকী তুই তাহলে এ দুটোকে একটু ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করিয়ে রাখিস। আমি যাই, মা আবার ভাববে।

লক্ষ্মী হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল — তোর মা কেমন আছে রে, ভাল আছে ত? একবার ত বেড়াতে আসতেও পারে না। অবিশ্যি আমারই যাওয়া উচিত, — কিন্তু যা কাজের চাপ। তোর কাকা মারা যাবার পর থেকে এক বিন্দু কোথাও এর জন্য পা বাড়াতে পারি না। সত্যি বলনা - এ না ক'রলে দু'-দুটো পেট চলবে কেমন করে?

মতিলাল বলল — মা ভালই আছে। তবে বয়েস বাড়ছে ত, আর ততটা খাটতে পারে না। কিন্তু আজ কি করে বসেছে দেখ্ না, — ছেলে বিলেত থেকে ফিরেছে এই আনন্দে নিজেই আজ রাঁধতে বসেছে। সপ্ত ব্যঞ্জন পঞ্চ তরকারি, ঝাল ঝোল মাছের মুড়ো কত কি। বলে ওখানে থেকে ত দেশী খাওয়া সব ভুলে বসে আছিস্। দুদিন ভাল করে খেয়ে একটু মুখ পালটা, আর একটু জিরোন খা।

শুধু কি তাই, — আবার একটা খেয়ালও ধরে বসেছে। আমি আর একা

থাকতে পারছি না, তুই সত্যিকারের বেটাই হবি, আমাকে কেন এত কষ্ট দিবি। এসেছিস যখন একটা বিয়ে করে বউ এনে দিয়ে যা আমাকে। আমি মাকে স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়েছি — মা ওসব আমি এখন পারব না সে তুই যাই বল। সবে কোথায় একটু নাম ডাক বেরুচ্ছে আর অমনি বউ এনে ছেলেকে ঘরে বাঁধার চেষ্টা। তা তুই কি বলিস্ কাকী। এই বয়েসে কি এখন বিয়ে থা করতে আছে।

লক্ষ্মী ম্লান হাসল — বলল কেন করতে থাকবে না। আর এই ত সময় বে করবার। খুব বয়েস হ'লে বে করবার আর দরকারই থাকবে না।

মতিলাল হেসে বলল — তা তুইও যখন বলছিস্ তখন একটা মেয়ে দেখ্ আমার জন্যে। আর কি হবে। কিন্তু বাবু ও সব কানা খোঁড়া, খেঁদী পেঁচী আমি বিয়ে করতে পারব না।

তবে কি মেম বে' করবি নাকি? বিলেত গিয়ে যে সাহেব হয়ে গেলি নাকি?

— সাহেব আমি হইনি কাকী। আর হতে চাইও না। তবে সত্যি যা তাই বলছি। একটু সুশ্রী, দুষ্টু মেয়ে হলেই আমার চলবে। বলে সে একবার আড়চোখে লালির দিকে তাকাল।

লালি উঠে গেল আসর থেকে। হয়ত কথার পিঠে কি কথা উঠবে এখনি। যত সব বাজে কথা।

লক্ষ্মী বলল — কেন মেয়ে ত ঘরেই রয়েছে। পছন্দ হয় না? তাছাড়া ও ত তোর কাকার বাগদত্তা মেয়ে। তোর কাকা মারা যাবার সময় উনি তোর বাবাকে কথা দিয়ে ছিল তার মেয়ের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তাটাকে যেন আরও জোরদার করে।

মতিলাল হাসল। বলল — কিন্তু যাই বল্ কাকী বিয়ে যদি করতেও হয় তবে এখন আমি ও সব পারছি না। আরও দু পাঁচ বছর যাক্ না। কথা যখন দেওয়া আছে আমিও কথা দিয়ে রাখছি না হয়। তাছাড়া লালিও পড়ুক, আরও কিছু শিখুক এই লাইনে! তখন দেখা যাবে। আচ্ছা যাই কাকী, — ও বেলা আসছি। তুই চা আর নারকোল মুড়ি ঠিক করে রাখিস্ আমার জন্যে।

লক্ষ্মী হেসে বলল — আচ্ছা, আচ্ছা তুই আয়না আগে। তারপর দেখা যাবে।

মতিলাল চলে গেল।

লক্ষ্মী গিয়ে লালিকে ধরল — কিরে মোতিকে তোর পছন্দ হয়? দেখ

বিয়ের কথা তুলব তোর?

লালি ঝংকার দিয়ে উঠল — তোর মরণ হয়না। এরি মধ্যে আমার বিয়ে দিতে চাস। আমি বিয়ে করব না যা।

— বে'করবি না ত কি আইবুড়ো হয়ে চিরকাল ধিঙ্গীপনা করবি নাকি?

— হ্যাঁ তাই করব। যা।

লক্ষ্মী চুপ করে চলে গেল তার নিজের কাজে।

ছয়

মতিলালের হাতে তবলা বাজছে।

লীলায়িত শব্দে সুমধুর তান বেরিয়ে আসছে তা থেকে। ওস্তাদ বাজিয়ের হাতে পড়ে তবলা যেন কথা কইছে। বলছে নাচ নাচ মেরে প্রভু কৃষ্ণ মুরারী রুমা ঝুমা ঝুম্ নেচে চল গিরিধারী।

লালির প্রাণবন্ত দুটি সুডৌল ঝুমুর বাঁধা পা তালে তাল মিলিয়ে পড়ছে আর সেই সঙ্গে সে নিজেও নানা রকম দেহ ভঙ্গিমার সাহায্যে কৃষ্ণের নৃত্য ভঙ্গিমা কিরূপ হবে তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

তবলা দ্রুত চলতে থাকে।

লালি নাচছে। মতিলাল বাজাচ্ছে আর তার ভবিষ্যতের সঙ্গীকে দুচোখ ভরে দেখছে।

তাক্ তাক্ ধিন ধিনা, ধিনা ধিনা তাক্।

রুম ঝুম্ ঝুম্ ঝুমা, ঝুমা ঝুমা ঝুম্।।

মতিলাল আরও জোরে হাত চালাল।

লক্ষ্মী দেখছে তার মেয়ের নৃত্য কুশলতা। দুচোখ দিয়ে তার আনন্দ প্রবাহ ছুটছে। নাঃ সত্যি মেয়েটা হ'ল কি। কি চমৎকারই না নাচছে। কি করে মুখপুড়ী মেয়ে এত শিখল। কোমরটায় যেন ওর হাড় নেই। হাতগুলোতেও বুঝি তাই।

মতিলালও ঠিক এই কথা চিন্তা করে মৃদু মৃদু হাসছিল। কি চমৎকার সাপল্ বডি। অমন সাপল্ বডি বড় কম নজরে আসে। সত্যি ওকে তালিম দিলে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে। আনন্দে বিভোর হয়ে মতিলাল তবলা থামাবার কথা ভুলে গেল। সে তাল লয় বজায় রেখে তেমনি অপ্রতিহত গতিতে বাজিয়ে চলল অনাদিকালের প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের ভজন নৃত্য।

ঘরের মধ্যে একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলছে। আলোক রশ্মি অল্প পরিসরটুকুকে মাত্র আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছে। লালির মুখে চোখে কখনও এই ক্ষীণ আলোক রশ্মির অল্প একটা স্পর্শ পড়ছে কখনও বা না। এই ভাবে আলো-আঁধারী ঘরের মধ্যে চলতে লাগল একের পর এক করে নাচের তালিম।

বাইরে চাঁদনী আলোর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ফিনিক্ ফুটছে। পাড়াগাঁয়ের সন্ধ্যা। এখনও হয়ত ঘড়িতে আটটা বাজেনি। চারিদিক এখনি নিস্তব্ধ নিঃঝুম্ হয়ে গেছে।

তবলা লহরার মধুর বাদ্য ধ্বনি স্পষ্ট ভেসে এল অদূরে দন্ডায়মান জমিদারের বাগানবাড়ীর দোতলায়।

দেবব্রত ছবি আঁকছিল পেট্রম্যাক্স জ্বেলে। সে শুনতে পেল এই মধুর বাদ্য ধ্বনি। আঁকা বন্ধ করে দেবব্রত ভাবল নিশ্চয়ই কোন ওস্তাদ বাজিয়ের হাতে এ তবলা বাজছে। সে না দেখেই তা চিন্তা করল। কিন্তু ও কিসের শব্দ। ঝুমুরের না! তাছাড়া শব্দটা আসছে ঐ ধোপানীদের বাড়ীর দিক থেকে। কি আশ্চর্য! তবে কি সেই মেয়েটি বাড়ীতে নাচছে? তাই হয়ত হবে। হয়ত বা ওর নাচের শিক্ষাগুরু এসেছে, তাই বাড়ীতে নাচের তালিম চলছে। দেবব্রত এসে নদীর ধারে বাইরের খোলা ব্যালকনিটাতে দাঁড়াল।

জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে দু'একটা ঝিঁঝিঁর শব্দ, আর পাশের বাড়ীর থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব নৃত্যের সুমধুর রিনি ঝিনি নিক্কনের শব্দ। দেবব্রত আকাশে চাঁদটার দিকে একবার তাকিয়ে কি চিন্তা করল। তারপর স্বগতভাবে বলে উঠল। সত্যিই মেয়েটি অপূর্ব — বিদুষী।

দেবব্রত বহুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল ছাদের ঐ বারান্দায়। শুনছে সে ঐ মধুর নৃত্য বাদ্য আর কল্পনার চক্ষে সে শ্রীরাধিকার নৃত্য পটিয়সী মূর্তিতে একটি ছবি আঁকছে। যদি সে আর একটি বার ওই মেয়েটিকে দেখতে পায়, আর একটি বার সে এই বাগানে আসে তবে সে তাকে অনুরোধ করবে তাকে একটা নাচ দেখাবার জন্য। অনাদিকালের প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার প্রাণবন্ত একটি ছবি সে আঁকতে চায়। এতদিন সে সামগ্রী খুঁজে পায় নি। পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে যাদের দেখেছে তাদের নিয়ে কি ভারতীয় নৃত্যকলার ওই সব ছবি আঁকা চলে। আর কল্পনার চোখ দিয়ে যে আঁকা সম্ভব তার বাস্তবের মূর্তিমতী সুন্দরীকে নিয়ে ওই বেশে আঁকা সে সম্পূর্ণ সহজ এবং স্বতন্ত্র। দেবব্রত চিন্তা করল তাকে চেষ্টা করতেই হবে। এই মেয়েটিই হবে তার শিল্পের প্রাণময়ী দেবী। মাত্র একটি দিনের মধ্যে সে যখন তার এই শিল্পী মনে এতখানি রেখাপাত করতে পেরেছে তখন ওরই যোগ্য আসন হবে

দেবব্রতের এই শিল্পসাধনার মধ্যে। পাশ্চাত্ত্য দেশের গৌরবর্ণা বিবসনা নারী মূর্তি আর ভারতীয় পল্লী বালিকার সরল স্বাভাবিক এই প্রাণময়ী মূর্তি ঠিক যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। বিদেশে ওদের দেখে মনে হয়েছিল তার চোখের তৃষা কল্পনার ক্ষুধা বুঝি মিটেছে। কিন্তু এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেবব্রত দেখল, সে তৃষায় সে শুধু ঘৃতাহুতি দিয়েই ফিরে এসেছে।

মতিলাল তার লহরী বন্ধ করে উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠল। - বাহবা লালি, বাহবা তোকে। সত্যিই তুই আমার মেডেলের যোগ্য অধিকারী। তোকে আমি সকালে একটা মেডেল দেবার কথা বলে গিয়েছিলাম। কিন্তু নাঃ যা দেখলাম তাতে আমার নিজেরই এখন লজ্জা হচ্ছে। ও তুই দুটোই রেখে দে। ও তোরই প্রাপ্য।

লালি ঘর্মাক্ত কলেবরে মুখে মৃদু হাসি এনে বলল — না, না মতিদা ও তুমি রেখে দাও। আমি ও মেডেল নিয়ে কি করব। আমার অনেক মেডেল এমনি ঘরে পচছে।

মতিলাল তবু শুনল না। সে জোর করে দুটো মেডেলই লালির হাতে গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু তুই এত শিখলি কি করে? ঘরে ত ভুলেও একবার তালিম দিস্ না। সেই স্কুলের সাপ্তাহিক একটা ক্লাসেই এত শিখেছিস্। নাঃ সত্যিই তোর কৃতিত্ব আছে। যাক্ তুই পাসটা করে নে আমি তোকে আমাদের দলে টেনে নেব। অমন সাপল্ বডি ওরা পাবে কোথাও মাথা খুঁড়লে। দেখবি তখন তোর কি নাম ডাক বেরুবে। তখন তুই আর এই অখ্যাত নামা গড়পুরের লক্ষ্মী ধোপানীর মেয়ে থাকবি না। তুই তখন শ্রীমতী লতা বাঈ। চলে আয় আমাদের দলে। কি হবে ঐ সব বিয়ে থা করে। বেশ কেমন থাকবি খাবি, নাচবি আর দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াবি। কেমন নির্ঝঞ্ঝাট। কি হাসছিস যে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি।

লক্ষ্মী বলল — তাই যা না-না হয় এখনি। কি হবে আর লেখাপাড়া শিখে। এখন থেকে গেলে তবু দুপয়সা হাতে করতে পারবি। আমাদের ত এতে খুব মত আছে। তারপর তোদের দু'জনে ইচ্ছে হয় তখন বে' করবি। সে তখন আটকাবে না, কি বল মতি?

মতিলাল হাসল।

লালির মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সে রাগতভাবে কোন কথার উত্তর না করে হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। উঠোনটা পেরিয়ে ও পাশের ঘরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়াল। যত সব বেমক্কা কথা। যা না নাচতে। হাতে তবু দুটো পয়সা আসবে এখন থেকে। নিতান্ত মতিলাল রয়েছে। নাহ'লে ওই মাকে আজ সে বেশ

করে দু' কথা শুনিয়ে দিত। কেবল সড় করে ওর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ফন্দি। আমি আর কিছুই করব না, নাচও শিখব না আর পড়তেও যাব না কাল থেকে; দেখি ও কি করে। কি কুক্ষণেই যে মরতে আজ নাচতে গেলাম। বদ্‌মাইস্ কোথাকার। কি চেহারার ছিরি। ওকে আবার মানুষে বিয়ে করে। দূর হ —, দূর হ — ।

লালি মুখটা তুলে একবার ওদিকটায় তাকাল। হঠাৎ সে কি দেখে চমকে উঠল। ও কি ! বাবুদের বাগানবাড়ীর ছাদে ওটা কি ছায়ার মত চলাফেরা করছে! মানুষই ত। চাঁদনী আলোতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কে ও । তবে কি আজ সকালের সেই বাবুটি। জমিদারের সেই বিলেত ফেরত ফর্সা ছেলে। কি যেন নামটা মা বলেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। দেবব্রত। বেশ নামটি কিন্তু। আর তাছাড়া দেখতেই বা কি কম। কেমন ফর্সা ধব্ ধব্ করছে রঙ। কেমন সুন্দর মাথার ওপর কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল, টিকালো নাক, আর হাসি হাসি মুখ খানি। আর কি স্বাস্থ্য। — সত্যি চমৎকার। সকালে বাগানে তাকে দেখে প্রথমটা কি ভয়ই না হয়েছিল। কিন্তু কি সুন্দর ব্যবহার ওই বাবুটির। নিজে হাতে কত ফুল তুলে দিলে গাছ থেকে। সত্যি তখন যা লজ্জা করছিল তার। যাক্ আর এক দিন গিয়ে চারটি ফুল চেয়ে আনতে হবে। বেশ একছড়া গলায় পরব আর মাথার খোঁপায় গুঁজব। গরীবের ত আর গয়না নেই। তবু যদি চেয়ে চিন্তে দুটি ফুল পাওয়া যায় তাই দিয়েই একদিন ফুলরানী সাজবো।

লালি হঠাৎ চিন্তা করল — সাজব ত বটে, কিন্তু দেখবে কে?

হঠাৎ ওর মনে হল কেন ওই বাবুটি। যে তাকে নিজে হাতে করে আজ ফুল তুলে দিল। লালি মনে মনে খুশি হয়ে পরক্ষণেই কিন্তু আবার বিমর্ষ হয়ে পড়ল। একি! সে যে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। দূর ছাই, কি যে হয়েছে আজ তার।

লক্ষ্মী বাইরে এসে ডাকল — কইরে লালি? হঠাৎ অমন করে চলে এলি যে। কি মেয়েই বাবা। আচ্ছা আচ্ছা আর বলব না। তোর বে' করার ইচ্ছে নেই এখন তা ত বললেই পারিস্। বেশ ত, এখন যেমন আছিস্ পড়ছিস্ তাই থাকবি, নে আয়। রাগ করিস্ নি। দেখ্ দেখি মোতি কত কি মনে করে বাড়ী চলে গেল।

যাক্‌গে চলে, তাতে আমার কি বয়ে গেছে। কে ওই ড্যাগারাটাকে বিয়ে করতে যাবে। ভারী ওস্তাদ নাচিয়ে একে বারে। উঁঃ, বাগদত্তা না ছাই। ও সব মা তুই আমায় আর কখনও বলিস্ নি। সত্যি আমি রাগ করে তখন কি করব দেখিস্।

লক্ষ্মী হেসে তার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে বলল — আচ্ছারে আচ্ছা। আর বলব না। আয় আমরা দু'মা বেটিতে খেয়ে শুই গিয়ে। রাত হয়েছে অনেক।

লালি তার মায়ের স্নেহ পেয়ে শান্ত হ'ল।

সাত

ওমা লালি। কোথায় গেলি এদিকে একবার শোন। লক্ষ্মী ডাকল।

লালি পড়ছিল। মায়ের ডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল কি বলছিস্ কি।

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে বলল — বলছিলাম কি এই কাপড় জামাগুলো একটু ওই বাগানবাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আয় না মা। ছোটবাবু নিজে এসে আর্জেন্ট দিয়ে গেছে। যা না মা একটু।

— আমি পারব না। যাব ত পড়া হবে কখন শুনি। গ্রীবাভঙ্গী সহকারে লালি উত্তর দিল।

লক্ষ্মী আবার বলল যা না মা লক্ষ্মীটি। এই ত এক পা রাস্তা। যাবি আর আসবি। কিই বা এমন দেরী হবে। তাছাড়া আজ ত তোর ছুটি। মনে করেছিস আমার মনে নেই না? লক্ষ্মী হাসল।

লালির মনে একটু আলোড়ন শুরু হল। যেতে তার আপত্তি নেই। সে ত প্রায় সব বাড়ীতেই গিয়ে জামা কাপড় দিয়ে আসে। কিন্তু কি জানি কেন এখানে যেতে তার হঠাৎ অহেতুক লজ্জা এসে তার মনকে ছেয়ে ফেলেছে। হয়ত সেই বাবুটি বাড়ীতে আছে। তাকে দেখে হয়ত কি না কি বলবে।

লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে থেকে দেবব্রতের আর্জেন্ট অর্ডার দেওয়া ধুতি পাঞ্জাবী জোড়া এনে লালির অনিচ্ছুক হাতে দিয়ে পুনরায় বলল — কি অত ভাবছিস্, যা মা একটু। জানি তোর এবার লজ্জা আসছে এসব কাজ করতে। কিন্তু কি আর করবি বল্, উপায়-ও ত নেই।

লালি মায়ের উপদেশের হাত এড়াতে শীঘ্রই নেমে পড়ল। — আমার এসব সত্যি ভাল লাগে না মা। ও সব তুই করবি এবার থেকে। বল্ কত দাম হয়েছে?

লক্ষ্মী হেসে বলল — দু'টাকা।

লালি নিজের কাপড়টাকে একটু সুবিন্যস্ত করে নিয়ে আঁচলটাকে ভালকরে কোমরে জড়িয়ে চলে গেল।

লক্ষ্মী তার মেয়ের ভঙ্গী দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসতে লাগল।

দেবব্রত ছবি আঁকছিল।

আজ আর কোন উপজীব্যকে সামনে রেখে নয়। আজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কল্পনাকে আশ্রয় করে। আজ সে আঁকছে গতরাত্রের কল্পনায় ধরা দেওয়া সেই শ্রীরাধিকার নৃত্য পটিয়সী মূর্তি। নৃত্যের তালে তালে শ্রীরাধিকা চলেছে যমুনা কিনারে। পরপারে যমুনা কিনারে কদম্বমূলে কৃষ্ণ বাঁশী হাতে বসে গরু চরাচ্ছে। ফুলে ফুলে কদম্ব বৃক্ষ সুশোভিত হয়ে রয়েছে। তারই দুটো ফুল তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তার নিজের কর্ণমূলে গেঁথেছে।

নদীর এপারে বাঁধান ঘাটে সখি সহযোগে শ্রীরাধিকা স্নানে নামছে। গোপীদের কয়েকজন আগে থেকেই যমুনার নীল জলে নেমে জলকেলি শুরু করেছে। শ্রীরাধিকা নৃত্যের ভঙ্গিমায় ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কর্ণগোচর হয়েছিল — তাই সে উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ছন্দের তালে তালে আস্‌ছিল। এক্ষণে ঘাটের সন্নিকটে এসে সে তার নয়ন বিমোহনহারীকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে আবেশে চেয়ে আছে। শ্রীরাধিকার মাথায় গাগরী। স্নান সেরে ফেরার পথে যমুনার জল নিয়ে যাবে কাঁকে করে। শ্রীরাধিকার একখানি হাত কোমরে অপূর্ব ভঙ্গিমাতে স্থির হয়ে আছে। আর একটি হাত মাথার উপরে গাগরীকে ধরে আছে। চরণে রয়েছে পাঁয়জোর। বাঁকা কাঁকাল আর জড়িত চরণে এক অদৃষ্টপূর্ব লীলাভঙ্গী। মুখে মন মোহিনীর স্নিগ্ধ হাসি। মৃদু মন্দ বাতাস বইছে। বাতাসে রাধার সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রান্ত ভাগ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও দেহ থেকে তার বসনখানি খসে পড়বার চেষ্টা পাচ্ছে। শ্রীরাধার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সখীরা ভ্রূকুটী করে কানের কাছে এসে কত কি বলছে — ঐ তোর বংশীধারী কৃষ্ণ বসে কদম্বমূলে। বাঁশীতে তোকে ডাকছে।

— তুই যা গিয়ে একবার পাশে দাঁড়া। আমরা আজ নয়ন ভরে দেখি।

কিন্তু দেবব্রতের হ'ল কি। সবই ত হয়েছে — কিন্তু শ্রীরাধিকার সে অনিন্দ্যসুন্দর মন-মুগ্ধকর চাহনিটা ত তার চোখের মধ্যে নিয়ে আসতে পারছে না। ঠিক যেমনটি সে কাল রাত্রে কল্পনার চক্ষে দেখেছে আকাশ পথে চেয়ে চেয়ে। ঠিক সেই মুখটি ফুটছে কই তার এই রঙতুলিতে আঁকা শ্রীরাধিকার মধ্যে। নাঃ অসম্ভব। কল্পনার সে মন-মুগ্ধকর প্রকাশটিকে ফুটিয়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব।

দেবব্রত বার-বার তার কল্পনাকে স্মৃতি পটে এনে স্থির ভাবে দাঁড় করিয়ে

রাখবার চেষ্টা করল। এস রাধা, কৃষ্ণ বিলাসিনী রাই কমলিনী, তুমি এসে মুহূর্তের জন্য সেই অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গিমা নিয়ে আমার চোখের সামনে দাঁড়াও। আমি তোমায় দেখি আর তোমার ওই অপরূপ ভ্রূভঙ্গিমা আমার এই রঙতুলিতে ফুটিয়ে তুলি। মনে মনে দেবব্রত তার কল্পনার সেই রাধাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

এই ত। এই ত সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চটুল হাসির সাথে অনিন্দ্যসুন্দর সেই ভ্রূভঙ্গি। আরও একটু, আরও একটু দাঁড়াও। দেবব্রত আবেশ ভরে একবার তার কাগজে আঁকা রাধার দিকে তাকায় আর একবার তার দক্ষিণপার্শ্বে তাকায়। ঠিক ঠিক মিলছে। ঠিক যেমনটি সে কাল রাত্রে দেখেছিল। ঠিক এমনি গ্রীবাভঙ্গি, এমনি মৃদু হাসি, এমনি ভ্রূকুটি, অপূর্ব! অপূর্ব!

দেবব্রত রঙের বাটী থেকে তুলিতে রঙ তোলে আর হাতের তালুতে একবার করে মুছে নেয়, আবার আঁকে। এবার আর কোন ভুল নেই। তার ছবি সত্যই এবার বুঝি প্রাণ পেল। আর কিই বা বাকি আছে। দেহ সৌষ্ঠব? দেবব্রত মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

দেরী হচ্ছে দেখে লালি এবার কেমন উস্‌খুস্‌ করে ডাকল — বাবু।

দেবব্রত এঁকে চলেছে।

লালি আবার ডাকল — ছোটবাবু আপনার কাপড়। কোথায় রাখব বাবু। বলে সে ড্রইং বোর্ডের পাশ থেকে একটু সরে আসে।

— কে! বিস্মিত চোখে দেবব্রত সামনে চেয়ে দেখল। একি! এযে সেই কালকের মেয়েটি। ধোপার মেয়ে। কি আশ্চর্য! সে এখানে, একেবারে তার ঘরের মধ্যে। দেবব্রত বিস্ময়ের চোখে শুধু চেয়ে থাকে। তার হাতের রঙ তুলি স্তব্ধ হয়।

সে চিন্তা করতে থাকে একি আশ্চর্য। এতক্ষণ কি তবে এই মেয়েটিকেই সে দেখে দেখে শ্রীরাধার ছবি আঁকছিল। না তার কল্পনার শ্রীরাধা মূর্তি ছেড়ে এবার ধোপানীর বেশে এসে সজীব হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

লালি আবার ডাকল — বাবু আপনার জামা কাপড় মা পাঠিয়ে দিলেন। কোথায় রাখব বলুন।

দেবব্রতের তন্ময়তা ছুটে যায়। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল এতক্ষণ সে কাকে দেখে কি এঁকেছে।

সত্যই এতক্ষণ লালি এসে দেবব্রতের ড্রইং বোর্ডের দক্ষিণ পাশটিতে দাঁড়িয়েছিল। দেবব্রতকে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকতে দেখে সেও তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

মুখে যেন তার কোন বাক্যস্ফূর্তি ছিল না। বিভোর হয়ে সে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে এতক্ষণ দেবব্রতকে দেখছিল। সে যে কে এবং কি কারণে এখানে এসেছে তা যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল। বিলেত থেকে ছবি আঁকা শিখে এসেছে জমিদারবাবুর এই ছেলে। ঘরে কত সুন্দর সুন্দর আঁকা ছবি রয়েছে। কিন্তু কি পাগল এই লোকটি। কতক্ষণ এসে সে এই ভাবে বোর্ডের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে অথচ এতটুকু খেয়াল-ই নেই। অথচ বার বার তার দিকে সে দেখছে আর তার কাগজে কি সব এঁকে চলেছে। লালির ডাকতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু কতক্ষণই বা আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়। হয়ত না ডাকলে বাবুর চেতনাই ফিরবে না সারাদিন। তাই লালি ডাকল — বাবু। আপনার কাপড় এনেছি ছোটবাবু। কোথায় রাখব?

দেবব্রত উঠে দাঁড়াল। হাতের তুলিটা জলের বাটিতে ডুবিয়ে রেখে বলল — ওঃ তুমি! কাপড় নিয়ে এসেছো। এই যে এখানেই রাখো।

লালি একটা ছোট টেবিলের মাথায় কাপড় আর পাঞ্জাবী ক'টা রাখল।

দেবব্রত যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। কি করে কি ভাবে এই গ্রাম্য যুবতীর সঙ্গে কথা বলবে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। সে চুপ করে রইল।

লালি বলল — দাম দেবেন ছোটবাবু?

— দাম? হ্যাঁ দোব বৈকি। কত হয়েছে বলতো তোমার দাম?

লালি বলল — মা বলে দিয়েছেন দু' টাকা।

মাত্র দু'টাকা। আচ্ছা দাঁড়াও। বলে দেবব্রত তার নিজের জামার পকেট থেকে একটা নোট বার করে নিয়ে এল। এই নাও ধর।

কিন্তু বাবু আমার কাছে ত খুচরো নেই পাঁচটাকার।

দেবব্রত চেয়ে দেখল সে একটা পাঁচটাকার নোটই এনেছে। সে আবার গিয়ে তার ড্রয়ারটা টেনে দেখল। কিন্তু নাঃ খুচরো ত নেই তার কাছে। সে ফিরে এসে বলল আমার কাছেও যে নেই — আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। এটা সবটাই তুমি নিয়ে যাও না কেন।

— সে কি বাবু! দু'টাকার বদলে পাঁচটাকা!

— কেন? তাতে হয়েছে কি। আমারও ভাঙ্গানি নেই তোমারও নেই। তবে তুমি নেবে না কেন?

লালি ঘাড় নেড়ে বলল তবে থাক্ বাবু এখন, মাকে পরে পাঠিয়ে দেব।

এসে নিয়ে যাবে।

দেবব্রত বলল — না, না সে হয় না। এটা তুমি নিয়ে যাও। এ ত আর এমন কিছু বেশী নয়। আচ্ছা ধর আমি খুশি হয়েই তোমায় দিচ্ছি। জানত আমরা জমিদার। অনেক আছে, যদি খুশি হয়ে কিছু দিইই তা নিতে হয়। এটা তুমি ধর।

লালি তখনও হাত গুটিয়ে রইল। সে একটু সরে এসে এতক্ষণ ধরে দেবব্রতের সেই সদ্য আঁকা শ্রীরাধার যমুনা স্নানে যাওয়ার ছবিটি দেখছিল। কি চমৎকার হয়েছে। লালি সব ভুলে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল — এ সব ছবি আপনি এঁকেছেন বাবু?

— কেন বলত?

— না তাই বলছি।

— হ্যাঁ, আমিই এঁকেছি। তোমার ছবি দেখতে খুব ভাল লাগে নাকি?

লালি চুপ করে থাকে। সে অন্য পাশে মুখ ফেরাল। কিন্তু ওকি! ওটা কি ছবি! ছোট্ট ঐ নদীর জলে কে যেন বিবস্ত্র হয়ে স্নান করছে। একি! এ যে ঠিক তারই মত দেখতে। কি আশ্চর্য তবে কি এই বাবুটি তাকে এভাবে কখনও স্নান করতে দেখেছে নাকি!

না, না তাই বা কি করে হয়। কোনদিন ত সে কাউকে তার স্নান করার সময় লক্ষ্য করতে দেখেনি। না, না এ তার ভ্রম। হয়ত তারই মত কোন মেয়ের ছবি হবে।

দেবব্রত লালিকে একদৃষ্টে ওই ছবিটিকে লক্ষ্য করতে দেখে নিজেও একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে এত শীঘ্র ওই ছবির উৎস নিজে এসে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে ওটা দেখবে। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। তার মুখে যেন আর কোন কথা আসতে চায় না। কি এক আশ্চর্যকর লজ্জাবোধ কোথা থেকে এসে তাকে যেন ঘিরে ধরল।

লালি ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে টাঙান ছবিগুলো সব দেখে বলল — যাই বাবু। দাম থাক্। মা এসে নিয়ে যাবে।

দেবব্রত জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলল — একটা কথা বলছিলাম্ —'

লালি মুখ তুলে তাকাল।

— তোমরা ত আমাদের প্রজা হও না?

লালি ঘাড় নেড়ে জানাল — হ্যাঁ তাই হয়।

— তোমার নাম কি?

— আমার নাম লতা। মা আমায় লালি বলে ডাকে। লালি বলল।

— লালি, লতা! বাঃ বেশ সুন্দর নামটি ত তোমার। কিন্তু —

— কিন্তু কি বাবু?

— নাঃ থাক্। আচ্ছা শুনেছি তুমি স্কুলে পড়, কোন ক্লাসে পড় তুমি?

লালির লজ্জার আবরণ যেন হঠাৎ কেটে গেছে। সে বলল — আমি মহামায়া বালিকা বিদ্যামন্দিরে ক্লাস নাইনে পড়ি। এমাসে পরীক্ষা দেব।

— বাঃ, চমৎকার। আচ্ছা লতা, তোমাদের বাড়ীতে কাল রাত্রে কে যেন নাচছিল বোধ হল। কে বলত? তোমার আর কোন বোনটোন আছে নাকি?

— না বাবু।

— তবে?

— আমিই নাচ্ছিলাম।

— ওঃ তুমিই নাচছিলে! তুমি নাচতেও জান তাহলে। বাঃ চমৎকার।

লালি আর অপেক্ষা করতে রাজী হল না। বলল — আমি যাই বাবু।

— আচ্ছা এস। কিন্তু তোমার দামটা নিয়ে যাও। আমি দিয়েছি বলো তোমার মাকে।

কি জানি কেন লালি আর কোন আপত্তি করল না। সে হাত পেতে দেবব্রতের কাছ থেকে পাঁচ টাকার নোটখানি গ্রহণ করল।

দেবব্রত বলল — আজ আমার এ্যাসিসট্যান্ট কোথায় যেন গেছে। না হলে তাকেই পাঠাতাম এ সব আনতে। তোমার ত কষ্ট হল।

লালি ম্লান হাসল। বলল — আমাদের আবার কষ্ট কি বাবু, এই ত আমাদের কাজ। আমরা যে গরীব।

দেবব্রত মনে আঘাত পেল। সত্যিই ত ওরা গরীব। ওদের খেটে না খেলে উপায়ই বা কি। দেবব্রত জিজ্ঞাসা করল তোমার বাবা আছেন?

— না। বাবা আজ দু'বছর হল মারা গেছেন। আমি যাচ্ছি বাবু —। লালি পা বাড়াল।

দেবব্রত ম্লান হেসে চুপ করে রইল।

লালি দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এসে হঠাৎ বলে ফেলল চাকর পাঠাবেন না বাবু, আমিই এসে আপনার কাপড় জামা দিয়ে যেতে পারব। এই ত এইটুকু পথ। দেবব্রত মনে মনে খুশি হ'ল। বলল — বেশ ত তাই এসো।

লালি চলে গেল।

দেবব্রত এসে আবার তার ছবির সামনে বসল। হাতে রঙের তুলিটা তুলে নিয়ে কোথাও শেষ ছোঁয়াটুকু দিতে হবে কিনা তাই চিন্তা করতে লাগল।

আট

নেপালের মহারাজের বাড়ী থেকে ডাক এসেছে দেবব্রতের। সেখানে গিয়ে ছবি এঁকে দিয়ে আসতে হবে। রাজা নূতন করে তাঁর রাজ দরবার আর নিজের বাসভবন সাজাতে চান। কম বয়সী যুবক রাজা হয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহ দেশ শাসনের দিকে তাঁর যত না ঝোঁক তার চেয়ে বেশী ঝোঁক এই কলা শিল্পের নিপুনতার দিকে। ডাক পড়েছে দেশ বিদেশের যত প্রখ্যাতনামা শিল্পীদের। যে যত ভাল করে ছবি আঁকতে পারবে তার তত বেশী মূল্য দেওয়া হবে। মোট ছবির সংখ্যা হবে আড়াইশো। রঙ তুলিতে আঁকা সে যে কোন ধ্রণের ছবি হলেই হল। তবে যা কিছু সব রাজার বাড়ীতে গিয়ে আঁকতে হবে। রাজার খেয়াল তিনি বসে বসে প্রত্যেকের ছবি আঁকা দেখবেন আর আঁকা শেষ হলে তাঁর বিচার বুদ্ধি দিয়ে সে ছবির মূল্য স্বীকৃত করবেন।

বিহারীলাল বলল — ছোটবাবু, যান্ আপনি। এ সুযোগ আর হেলায় হারাবেন না। ও রাজা ছবি পাগলা। সত্যি যদি একখানা ছবি ওঁর চোখে ধরাতে পারেন তবে নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়ে যাবে।

দেবব্রত হেসে বলে — কি আর হয়ে যাবে বিহারী, আমার ও সব অর্থ আর পুরস্কারে বিশেষ কোন লোভ নেই। আমি চাই প্রকৃত সুন্দর জিনিস। ও কমপিটিশনে ছবি আঁকতে যেতে আমার মন চাইছে না। ও সব রেষারেষিতে শেষ পর্যন্ত কখন কি খেয়াল চেপে বসবে ঘাড়ে, আমার এতদিনের শিল্প সাধনা সব মাটি হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুই রাজাকে আমার নামে একটা চিঠি দিয়ে দে যদি কমপিটিশন্ শেষ হবার পর রাজা একা আমার ছবি আঁকা দেখতে চান ত আমি গিয়ে দেখিয়ে আসব। যা বুঝছি চিঠিতে তা থেকে আমার ত মনে হয় ওঁর দেখাটাই বড় প্রশ্ন জিনিসটা তত নয়।

— সে আপনি যেমন বোঝেন ছোটবাবু। তবে আমার মতে ও আপনার যাওয়াই ভাল ছিল। আচ্ছা আপনি কেন অন্য রকম করে একটা চিঠি দিন না - — যে সকল-কার সঙ্গে বসে আপনি ছবি আঁকতে পারবেন না। আপনার জন্য চাই স্বতন্ত্র একটি ঘর এবং আপনার মন মত পরিবেশ।

— তুই ঠিক বলেছিস্ বিহারী ও হ'লেও চলবে। তবে ঠিক এই বলেই তুই একটা চিঠি দিয়ে দে। আর আমি আসছি বাড়ী থেকে। দেখি মা বাবার আবার কি মত। বাইরের নাম করলেই ত ওনাদের যত ভয় এসে জড় হয় কিনা। কি জানি বিদেশ বিভুঁই —।

বিহারীলাল বলল যান একবার ঘুরে আসুন। আমি আপনার চিঠি লিখে রেখে দিচ্ছি। এসে সই করে দেবেন।

দেবব্রত উঠে পড়ল।

বাগানের ওপাশে রাস্তার দিকে ঘোড়াশাল। দেবব্রত এসে কোচোয়ানকে বলল — কোচায়ান তোমার গাড়ী তৈরী আছে? চল দেখি আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী যাই।

কোচোয়ান রহিম বক্স ছোটকর্তাকে সেলাম ঠুকে বলল — গাড়ী তৈরী ছোট সাব। আপনি উঠুন।

দেবব্রত এসে ফিটনে চেপে বসল।

কোচোয়ান অবিলম্বে ঘোড়া যুতে নিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

গাড়ী এসে বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় বাঁধলে দেবব্রত নেমে সোজা গিয়ে মা মৃন্ময়ীদেবীর কাছে পৌছাল। হাতে চিঠিটা ছিল। দেবব্রত চিঠিটা ম্যাকে দেখিয়ে বলল — মা অনেক দিন পরে আজ একটা চমৎকার ছবি আঁকার সুযোগ এসেছে। নেপালের মহারাজের বাড়ী থেকে। সেখানে গিয়ে মাস খানেক থেকে ছবি এঁকে দিয়ে আসতে হবে। যাব মা?

মৃন্ময়ীদেবী সব কথা শুনে চিন্তিত হয়ে বললেন তা আমি কি করে বলি বল দেখি। যা রাগী মানুষ উনি। যদি ওর মতে না মেলে ত হাঁক্ ডাক্ করে, চিৎকার করে বাড়ী মাথায় করবেন। তা তুই একবার যানা ওনার কাছে। আর যখন এই কাজই শিখেছিস্ তখন অমত করার কি আছে।

দেবব্রত বলল — তুমিও চল মা সঙ্গে। ও আমি একলা পারব না। তুমি আমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি ভরসা পাব। চল মা। সে মৃন্ময়ীদেবীকে আঁকড়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল পাশের ঘরে।

— আঃ কি জ্বালাতনই না তুই করতে জানিস দেবু। এতে আবার ভয়ের কি আছে। যা-না তুইই বল-না। আবার আমাকে কেন টানাটানি। যাই হোক্ তবু ছেলের টানাটানিতে মাকে শেষ পর্যন্ত আসতেই হ'ল।

রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদ তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে চোখে চশমা এঁটে নিবিষ্টচিত্তে কি একটা বই পড়ছিলেন।

একসঙ্গে মা-ও ছেলেকে ঢুকতে দেখে মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে বললেন — কি ব্যাপার? একেবারে যে মা ব্যাটায় একসঙ্গে? ছেলে আজ যে বড় সকাল সকাল দেখি। ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়, তাই এত তাড়াতাড়ি।

— না, না তার জন্য নয়। এসেছে তোমার কাছে একটা মত নিতে। কি রে খোকা, কি বলবি বলনা —। মৃন্ময়ীদেবী মাথার কাপড়টা একটু টেনে নিয়ে ছেলেকেই ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

দেবব্রত এগিয়ে এসে নেপাল মহারাজের চিঠিটা তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে বলল — মহারাজ বিশেষ করে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমারও ইচ্ছা একবার ঘুরে আসি। দেশটাও দেখা হবে আর সেই সঙ্গে কতকগুলো ছবি আঁকার সুযোগ —।

— বেশ ত যেতে চাও যাও। চিঠিটা পড়া শেষ করে রায়বাহাদুর গড়গড়ার নলটি একপাশে ঠেলে রেখে বললেন — তবে কথা হচ্ছে কি, এ সব খামখেয়ালী তোমার আর কতদিন চলবে তার একটা স্পষ্ট কথা আমাকে জানিয়ে দিও।

দেবব্রত মুখ তুলে একবার বাপের দিকে তাকাল। সে ঠিক অনুমান করতে পারল না বাবা কি ইঙ্গিত করতে চান।

রায়বাহাদুর বললেন — আমার শরীর বেশ ভেঙ্গে পড়ছে দিন দিন। আর হয়ত বেশী দিন এভাবে টানতে পারব না। বুকের সেই ব্যথাটা মাঝে মাঝেই বেশ যন্ত্রনাদায়ক হয়ে উঠছে। তাছাড়া ওদিকে জমিদারির অবস্থাও বেশ সুবিধাজনক নয়। আমার সে প্রভাবের হ্রস্বতা দেখে ওরা পেয়ে বসেছে। ওদের আবার কড়া হাত দিয়ে শাসন না করলে জমিদারির আয় কমতে কমতে একেবারেই বন্ধ হবে। ওসব খেয়াল খুশী থাকে থাকুক কিন্তু সেই সঙ্গে এবার ফিরে এসে নিজে সব কিছু দেখে শুনে নাও। আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব।

দেবব্রত বাবার মত পেয়ে আনন্দের সঙ্গে বলল — আমি কথা দিলাম বাবা ফিরে এসে আমি এসব বিষয়ে একটু করে মন দেবার চেষ্টা করব।

— তা হলে তুমি কবে যাচ্ছ এখান থেকে? রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন।

— তা যত শিগ্‌গীর যাওয়া যায় ততই ভাল বাবা। আপনি যদি বলেন আমি কাল পরশু রওনা হতে পারি।

— বেশ ত তাই যাও। কিন্তু এই সময় যাচ্ছ ওখানে বেশ শীত পড়ে গেছে। নিজের গরম জামা কাপড় যা আছে সব তোমার মার কাছ থেকে গুছিয়ে নিয়ে যেও। আর সাবধানে থাকবে। একটু থেমে তিনি আবার বললেন — আর টাকারও ত কিছু দরকার।

দেবব্রত মাথার চুলে হাত দিয়ে উস্‌খুস্‌ করতে লাগল।

ওরে ও ভজ। — দেওয়ানজীকে বোলা একবার।

দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী এসে দাঁড়াল।

— দেবুকে শ পাঁচেক টাকা দিয়ে দিন দেওয়ানজী। ও নেপাল যাবে কাল। আর ওর সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।

— যে আজ্ঞে বাবু। বলে দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী প্রণাম সেরে চৌকাঠ পার হয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দেবব্রতের জন্য।

দেবব্রত তার মায়ের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে একটা সোফায় বসল। কি ভাগ্যিস বাবার মেজাজটা আজ এত ঠাণ্ডা। আমি ত আশাই করতে পারি নি মা। যে এত সহজে হয়ে যাবে। যাক্‌ মত যখন পাওয়াই গেল — তখন শুভস্য শীঘ্রম্‌। কালই যাত্রার আয়োজন করা যাক্‌।

ব্রজেন চৌধুরী গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে এসে এক পাশে দাঁড়াল।

মৃন্ময়ীদেবী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বললেন — কিছু বলবেন?

— আজ্ঞে দেববাবুকে বলছিলাম।

— বলুন কি বলবেন। দেবব্রত বলল।

— বলছিলাম টাকাটা কি আজই দিয়ে দেব আপনাকে, না কাল সকালে নিলেই চলবে?

— আজ্ঞে নিয়ে আর কি করব আমি। আর যাব ত সেই কাল। আপনি কালই দেবেন।

— যে আজ্ঞে। ব্রজেন চৌধুরী চলে গেল।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন — কি এমন ছবি আঁকতে হবে যে দেশ জুড়ে সব শিল্পীদের ডাক পড়েছে।

— তা ত ঠিক বুঝতে পারছি না মা। তবে আমার যতদূর ধারনা তাতে মনে হয় মহারাজের এ শুধু নিছক একটা খেয়াল। নিজেও এই বিষয়ে এক রকম পাগল বললেই চলে। সখ হয়েছে একসঙ্গে বসিয়ে সবার ছবি আঁকা দেখবেন। ছবিটা তাঁর বড় কথা নয়। তবে যোগ্যতা প্রমাণের জন্য ওটা দরকার পড়বে পরে। যাক্ আশীর্বাদ করো মা যেন জয় লাভ করে ফিরতে পারি।

মৃন্ময়ীদেবী পুত্রের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

— তোমার রান্না হয়েছে মা। সত্যি, বাবা ঠিক বলেছেন কিন্তু। আমার ক্ষিদেটাও যেন আজ তাড়াতাড়ি পেয়েছে। বোধ হয় তারই তাগিদে আজ এত সকাল সকাল এসে পড়েছি।

মৃন্ময়ীদেবী উঠে বললেন — ঠাকুরের হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এতক্ষণ। তুই স্নান করে নে না। ততক্ষণ আমি দেখছি ঠাকুরকে বলে।

— তুমি ভজকে দিয়েই ত খবরটা পাঠাতে পারতে মা, আবার নিজে উঠতে গেলে কেন। দেবব্রত জামা ছাড়তে ছাড়তে বলল।

অতঃপর স্নান সেরে দেবব্রত রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে দেখল। মৃন্ময়ীদেবী ভাতের থালার সামনে বসে পাখার বাতাস করছেন।

রোজকার নিয়ম মত দেবব্রত আচমন শেষ করে মেঝেতে বিছান আসনে বসে খেতে লাগল। — সত্যি মা এই দু'টো বছর বিদেশে থেকে বিলীতি প্রথায় টেবিল চেয়ারে খেয়ে এমন একটা বদ অভ্যাস হয়ে গেছে যেন আর এভাবে খেতেই পারি না। অথচ তুমি থাকতে অনাচারও ত করতে পারি না।

মৃন্ময়ীদেবী পাখার বাতাস করতে করতে বললেন — শুধু আমি থাকতে কেন দেবু — এ বাড়ীতে যতক্ষণ লক্ষ্মী নারায়নের মূর্তি আছে ততক্ষণ তুমি ওসব সাহেবিপনা করতে পারনা। সে তুমি হাজার বিলেত ঘুরেই এস, আর যাই কর। যা তোমার বাপ ঠাকুরদা চিরকাল করে এসেছেন সেটা তোমাকেও মেনে চলতে হবে বৈকি।

দেবব্রত মৃদু হাসল।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন — তোমাকে কিন্তু আমার নিজের একটা কথা বলার ছিল দেবু। তুমি যাচ্ছ যাও। ফিরে এলেই বলব।

— কি কথা মা? দেবব্রত মুখ তুলে তাকাল।

— যাক না আর ক'টা দিন। ঘুরে এলেই বলব এখন। তাড়ার কিছু নেই।

— না মা, সে হবে না। কথা যখন তুলেছ বল কি এমন সে কথা। নইলে আমার সত্যি খাওয়া হবে না। তাছাড়া সব সময় মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকবে। কি কথা মা? —

মৃন্ময়ীদেবী মৃদু হেসে বললেন — বড় মেয়ের বিয়ে থা হয়ে চলে যাওয়ার পর ত বাড়ীটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। তুইও ত বাড়ীতে থাকিস্ না সব সময়। অথচ আমি কি নিয়ে কাটাই বলত জীবনটা। এমনি নিঃসঙ্গ করে আর কতদিন রাখবি। ওখান থেকে ফিরে এসে জমিদারিতেও যেমন মন দেবার কথা তোমার বাবাকে বললে তেমনি সংসারেও একটু মন দাও। এবার একটা বিয়ে কর। আমাদের বয়স হয়েছে। তুমিও বড় হয়েছ। এই সময়ে বিয়ে করাটাই আমি যুক্তি সঙ্গত মনে করি। এখন দেখ তুমি বিচার করে। মাকে যদি এমনি করেই শাস্তি দেবার ইচ্ছা থাকে ত আর কিছু বলব না।

দেবব্রত ম্লান হেসে বলল — আমি তোমায় শাস্তি দোব মা। এ কথা বলো না মা। কিন্তু সত্যি মা, ওই বিয়ে থা আমার দ্বারা এখন করা হবে না। সত্যি বলছি মা, আমার যেন ভয় হয় বিয়ে করলেই আমার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলব। তুমি আর কিছু আদেশ কর মা, লক্ষ্মীটি।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন — আদেশ করবার মত সুযোগ আর তুমি দিচ্ছ কই বাবা। তুমি বড় হয়েছ। শিক্ষিত হয়েছ, তোমাকে আদেশ করে কি আর আমি যা তা করাতে পারি। তবে বলবার আর আমার কিছুই রইল না। উপযুক্ত হয়েছ, ফের একবার কথাটা ভেবে দেখ।

দেবব্রত খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

মৃন্ময়ীদেবী হাতে দু' কুঁচো সুপুরি এনে ছেলেকে দিলেন।

দেবব্রত আরও কিছুক্ষণ থেকে রোজকার নিয়ম মত বৈকালের দিকে তার বাগানবাড়ীতে এসে হাজির হ'ল।

বিহারী এসে বলল — ছোটবাবু এই নিন্ আপনার চিঠি তৈরী। কেবল একটা সই করে দিন।

দেবব্রত চিঠিটা এক পাশে ঠেলে দিয়ে বলল — ওর আর দরকার হবে না বিহারী। আমি কালই যাব ঠিক করেছি। তুই বরং আমার জিনিস-পত্রগুলো গোছ গাছ করে রাখ্। তাছাড়া তুইও সঙ্গে যাবি। নইলে সেখানে গিয়ে আমায়

হয়ত অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে। খেয়ালের বশে চান-খাওয়ারও হয়ত ঠিক থাকবে না। কি অমন মুখ কাচু মাচু করছিস্ কেন? যেতে পারবি না নাকি?

— না ছোটবাবু, সেজন্য নয়।

— তবে?

— অত খরচ আমি —

— তুমি আসলে একটি হস্তীমূর্খ। আমার সঙ্গে যাবে আর তুমি পকেট থেকে অত খরচ করবে কেমন। যা সে চিন্তা তোকে করতে হবে না। নিজের জিনিসপত্রও এই সঙ্গে গোছগাছ করে নে। আর যাবার ট্রেনের সময় ইত্যাদি গুলো একটু আজই খবর নিয়ে রাখ্। বুঝলি।

— যে আজ্ঞে। বিহারী চলে গেল।

— দেবব্রত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের ইজি চেয়ারটাতে এসে গা এলিয়ে দিল।

নয়

মেয়েটা রোজ আনা গোনা শুরু করেছে।

বাবুর বাগানে এসে রোজ তার কিছু ফুল তোলা চাই নিজে হাতে। তাছাড়া ফুল তার একার জন্যই যে দরকার তা নয়। বাবুর চাকর মালীগুলো সব অমানুষ। অমন বিলেত ফেরৎ সাহেব তায় আবার ছবি আঁকা সৌখীন বাবু! কোথায় ঘর-দোরগুলো একটু সাজিয়ে রাখবে তাও পারে না। যে যার কর্তব্য করেই ক্ষান্ত। বাড়ীতে কেউ নেই দেখে মালীও গা ঢাকা দেয় দিনের বেশীর ভাগ সময়টা। বিহারীলাল বাবুর সঙ্গে গেছে। এখানে থাকার মধ্যে আছে কোচম্যান রহিম। আর মালী শ্রীধর।

লালি রোজকার মত আজও সকালে এসে ফুল তুলছিল। মালী বলল - — তুই এসেছিস লালি। যাক্ বাঁচা গেল। বাবুর আসবার কথা আছে ত শুনছি আজ। কিন্তু কি করি বলত — আমি যে বড় মুস্কিলে পড়েছি।

লালি মৃদু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে — কি হ'ল আবার তোমার শ্রীধরদা? বউয়ের অসুখ করল নাকি ফের?

— ঠিক ধরেছিস্ ত। সত্যি বলছি লালি একবার গিয়ে না দেখে এলে মনটা কেমন কন্ কন্ করছে। তা যাই কি করে সব ফেলে বলত? তবে তুই যদি

একটু দয়া করিস্ ত আমি একটু ঘুরে আসতে পারি।

— আমি দয়া করব বড় লোকের মালীর ওপর। সে কি গো শ্রীধরদা। আমি কি দয়া করব তোমাকে। বলে লালি ফুল তুলতে তুলতে হেসে আটখানা হয়ে পড়ে।

— হাসি নয়। সত্যি বলছি।

— কি?

— বলছিলাম তুই যদি একটু বাবুর ঘরটা দেখাশোনা করে দিতিস্ ত আমি এবেলা গিয়ে ওবেলার ভেতর ঠিক ঘুরে আসতাম্। দেখবি একটু! আগ্রহান্বিত হয়ে শ্রীধর এগিয়ে এসে লালিকে বলে।

লালি মুখ গম্ভীর করে বসে, কিন্তু আমি যদি তোমার বাবুর জিনিসপত্র কিছু চুরি করে চম্পট দিই।

— না রে না। সে তুই পারবি না, সে আমি জানি। কি বল না, আমি যাব? করে দিবি ত কাজটা?

— যাও তবে। কিন্তু দেরী করো না বাপু। আমি তা হলে বাবু এলে তোমার সব গুণকীর্তন বলে দোব। তুমি রোজ রোজ বউয়ের অসুখ করেছে বলে পালাও। জান ত তোমার বাবুর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে।

— মালী এসে লালির হাত দুটো ধরে মিনতি করতে গেল। — বলিস্ নি সত্যি। সত্যি জ্বর হয়েছে বউয়ের, এই দেখ্ চিঠি পাঠিয়েছে। তুই ত পড়তে জানিস। দেখ্ না পড়ে কি লিখেছে।

শ্রীধর চিঠিটা ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে এগিয়ে দেয়।

লালি বলে — থাক আর তোমার বউয়ের চিঠি পড়ে আমার কাজ নেই। যেতে চাইছ যাও। কিন্তু সত্যি যদি বাবু এসে যায় আর তোমার বদলে আমাকে দেখে, তখন আমি কি বলব বলো ত?

— কি আর বলবি! যা হোক্ একটা কিছু বলবি। সত্যিই ত আর বাবু দিনের দিকে আসছে না। আসে ত সেই রাত্তিরে। আচ্ছা আমি চলি তাহলে, একটু দেখিস কিন্তু। এই নে ধর চাবি কাঠি। ফিরে এসে তোর বাড়ী থেকে নিয়ে আসব গিয়ে।

লালি অগত্যা শ্রীধরের কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে নিজের আঁচলে বাঁধল।

শ্রীধর মুখে হাসি টেনে বলল — সত্যি তুই যদি ছোট বাবুর বউ হতিস্ না, বেশ মানাত কিন্তু।

লালি ধমকে উঠল — আবার ঠাট্টা হচ্ছে। যাও যাও দেরী করো না।

শ্রীধর বলল — কেন যে মরতে ছোট ঘরে জন্মাতে গেলি, সত্যি তোর জন্যে আমার দুঃখু হয়।

— আর দুঃখু করে কাজ নেই, শিগ্গীর যাও নইলে বাস পাবে না।

শ্রীধর বলল — ঠিক বলেছিস্ তুই। সত্যি সকালের বাসটা ফেল করলে আর যাওয়াই হবে না। আচ্ছা চলি। দেখিস্।

শ্রীধর চলে গেল।

ফুল তোলা শেষ করে লালি এসে দেবব্রতের ঘরের দরজার চাবি মুক্ত করল। হাতের ফুলের চুবড়িটা একটা কাঠের চৌকির ওপর রেখে সে একবার থমকে দাঁড়াল।

ঘরটার কি শ্রীই না করে রেখেছে!

বাবু গেছে ত একটা মাসও হয়নি। কিন্তু এরি মধ্যে ঘরের যা হাল হয়েছে দেখলে কান্না পায়। সহজ সরল মনিবটিকে পেয়ে চাকর বাকরগুলোও সব পেয়ে বসেছে। যদি এতটুকু কাজও দৈনিক করে রেখেছে। টেবিল-চেয়ার জিনিসপত্র এমন কি দেওয়ালে টাঙান ছবিগুলোতে পর্যন্ত একপুরু করে ধুলো-বালি জমেছে।

লালি একটা ছবির কাঁচে আঙ্গুল দিয়ে একটা টান দিয়ে দেখল। সত্যিই এ কি! ওরা মানুষ না। এত সুন্দর সুন্দর সব ছবি, দু'দিনে যে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। ছিঃ ছিঃ।

লালি নিজের শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল। এ সে কি করতে চলেছে। কিসের তার গরজ এত খাটবার। জমিদারবাবুর ছেলে তার কে হয় যে তার জন্য সে এত করবে। লোকে দেখলে বলবে দাসী-বাঁদীগিরি করতে নেমেছি। তা কপালে বুঝি এইটুকুই আর বাকী আছে। কিন্তু এ রকম নোংরামিও ত চোখে দেখা যায় না। তাছাড়া কেউ ত এখন আর আসছে না তার এই ঘর পরিস্কার করা দেখতে। যদি শ্রীধরের কথাই সত্যি হয় তবে তার অনেক আগেই সে সব কিছু চমৎকার করে পরিষ্কার করে ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে রাখতে পারবে।

লালি ঘরের ওপাশের আলনা থেকে একটা ঝাড়ন টেনে নিয়ে প্রথমে ছবি গুলোর কাঁচ পরিষ্কার করল। তারপর একে একে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসপত্র

আঁকার সাজ-সরঞ্জাম বোর্ড সব গুলোকে মুছে ধুলিশূন্য করল। তারপর দেবব্রতের বিছানাটাকে ঝেড়ে ঘরের মেঝেটাকে ঝাড়ন ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিল। তারপর দ্বিতীয়বার ছবিগুলোকে চেপে মুছল। সমস্ত কাজ সেরে সে তার ফুলের চুবড়ীটা হাতে করে এসে দাঁড়াল ওদিককার টেবিলে রক্ষিত চীনামাটির ফুলদানিটার কাছে। লালি ভাবল যার বাগানবাড়ীতে রোজ এত ফুল ফোটে তার ঘরের ফুলদানিতে একটা ফুলও রাখা হয় না। বড় আশ্চর্য লাগে। লালি অতি সযত্নে ফুলগুলো ফুলদানিতে রেখে কয়েকটা ঝাউয়ের পাতা আর বুনো ফার্ণের পাতা নিয়ে এসে ফুলগুলির আশে পাশে মাঝে মাঝে গুঁজে দিল।

চমৎকার হয়েছে এইবার।

এতদিনে ঘরটা যেন একটু মানুষের মত হল। ওঃ আচ্ছা খাটিয়ে নিলে যাহোক শ্রীধরদা। আসুক একবার তারপর দেখব। দুটো ফুল দেয় বলে এতখানি কাজ করিয়ে নেওয়ার মজাটা আমি বোঝাব।

লালি ফুলের চুবড়ীটা হাতে করে এসে সেদিনের আঁকা সেই রাধা-কৃষ্ণের ছবিটার তলায় দাঁড়াল। ফ্রেমে এঁটে ছবিটার রূপ যেন আরও দশগুণ বেড়ে গেছে। লালি তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি কি সুন্দরই না হয়েছে। আহা সে যদি আঁকতে জানত তবে বেশ হ'ত। কেমন দিন রাত রঙ আর তুলি নিয়ে বসে বসে কত ছবি আঁকতাম।

হঠাৎ লালির কি খেয়াল গেল। সে এসে বোর্ডে আঁটা একটা স্কেচের তলায় দাঁড়াল। কিন্তু কি যে ছাই আঁকা আছে ঠিক বুঝতে পারল না। লালির ইচ্ছে গেল একবার একটা কাগজে রঙ দিয়ে কিছু আঁকে। সে একটা তুলি তুলে নিয়ে কিছু রঙ গুলল। সে একটা তুলিতে রঙ মাখিয়ে চিন্তা করল — কিন্তু যদি খারাপ হয়ে যায় ছবিটা। যদি বাবু এসে বকে — নাঃ থাক্।

দেবব্রত এসে ঘরে ঢুকে এতক্ষণ ধরে লালির ছবি আঁকার ইচ্ছাটা আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু যখন সে রঙ তুলি আবার রেখে দিল তখন সে ড্রইং বোর্ডের পিছন থেকে সরে সামনে এসে বলল — থাক্ কেন লতা। আঁকতে ইচ্ছে হয়েছে আঁক না, আমি বকব না।

লালি লজ্জায় মরে গিয়ে টুলটা ছেড়ে উঠে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ছিঃ ছিঃ এসে কি করে বসছিল এখনি। লালি আরও লজ্জিত হল এইভেবে এখন সে কি সদুত্তর দেবে, এই পরিস্থিতির মধ্যে সে একা কি করছিল।

দেবব্রত চারিদিকটা একবার চেয়ে দেখে তার হাতের স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখে বলল — কি ব্যাপার আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি না লতা। এরা সব

কোথায়? অথচ তুমি এখানে এভাবে!

লালি চুপ করে থাকে। লজ্জায় মরে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি কোমরে জড়ান আঁচলটা খুলে গায়ে দিল। তারপর সে তার হাতের আঙুলে শাড়ীর খুঁটটা খুলে বারবার জড়াতে থাকে আর খুলতে থাকে। কিন্তু কতক্ষনই বা এইভাবে থাকা যায়। শেষ পর্যন্ত লালিকে সত্য কথা সব খুলে বলতেই হল। শ্রীধরদা বাড়ীতে নেই। তার স্ত্রীর অসুখ করাতে সে আজ সকালে তাকে চাবি দিয়ে একবার বাড়ী গেছে। ও বেলা নিশ্চয়ই করে আসবার কথা দিয়ে গেছে। তাছাড়া কোচোয়ানও ছিল, তবে বাড়ীতে বড়বাবু নাকি কোথায় যাবেন বলে সেও চলে গেছে গাড়ী নিয়ে। এই নিন আপনার ঘরের চাবি। আমি যাচ্ছি' একটু দেখে নেবেন সব।

চাবিটা লালির হাত থেকে নিয়ে দেবব্রত বলল — কেন তোমাকে অবিশ্বাস করি বুঝি?

— আমি ত পর। বিশ্বাস করাটা কি উচিত।

দেবব্রত একটু সরে এসে বলল — সত্যি লতা; আমি তোমাকে এখানে আসার পর থেকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছি না। একটা কথা বলছি লতা — কিছু মনে করো না। তুমি আজ ঠিক যেমনটি করে আমার জিনিসপত্র ঘর-দোরকে নিজের করে নিয়েছ তেমনি করে কি তুমি আমাকেও নিতে পার না লতা? আমি তোমার মত এমনি একটি সঙ্গী, বান্ধবীকে মন-মন আশৈশব খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি দেশ বিদেশে কত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু ঠিক তোমার মত একটি মেয়েকেও আমি দেখলাম না। তোমার অসাধারণ মেধা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও রূপ লাবণ্য সত্যি আমায় মুগ্ধ করেছে। আজ বাড়ীতে কেউ নেই। বিহারীও আসেনি। ফেরার পথে সে দেশে গেল। আজ যখন আমি তোমাকে এত আপন করেই কাছে পেলাম লতা, তখন আমি তোমাকে ক'টা কথা বলতে চাই।

লালি বলল আমি যাই ছোট বাবু।

— না লতা। যেও না দাঁড়াও। তুমি আমার কথাগুলো শুনে তবে যাও। তোমাকে আমি যা বললাম সব সত্য। আমি তোমার গুণ-মুগ্ধ। কিন্তু তৃপ্ত নই তোমার সব কিছু পেয়ে। তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ। তোমাকে বলতে আমার বাধবে না। আমি শিল্পের সাধক। রূপ-রস-সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। আমি তোমার কতখানি ভক্ত জানি না, তবে তোমার এই সব বাহ্যিক সৌন্দর্যবলীর চরম ভক্ত হয়ে গেছি। তুমি আমাকে তোমার আরও কিছু দিয়ে ধন্য কর। আমি চাই তোমাকে আমার শিল্পের প্রতীক করতে। তুমি হবে আমার জীবন্ত

লাস্যময়ী দেবীমূর্তি। আমি চাই তুমি রোজ এবাড়ীতে আস। আমাকে কিছু উৎসাহ কিছুক্ষণ দর্শন ও আমার এই কাজে সামান্য কিছু প্রেরণা দিয়ে যাও।

লালির কান দু'টো টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। সে আর যেন শুনতে পারছিল না। এ কি সে জেগে স্বপ্ন দেখছে নাকি? তার মত একটা ছোট জাতের মেয়ের ওপর উচ্চ বংশের অমন সুন্দর সুপুরুষ ছেলের এত লোভ! কিন্তু কিসের এ লোভ। সেই সাধারণে যা চেয়ে থাকে? নর নারীর কাছে যা চিরকাল যাঞ্চা করে এসেছে। দেবব্রতও কি তাই করজোড়ে যাঞ্চা করছে আজ তাকে এমন একলাটি পেয়ে। ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণ্য মন এই পুরুষ জাতটার।

— তুমি ভুল বুঝো না লতা। আমি তোমার কাছ থেকে অন্য কিছু চাই না। শুধু তোমার বন্ধুত্ব ও সঙ্গটা আমি একান্তভাবে প্রার্থনা করি। শুনেছি তুমি নাচতে জান। আমি দেখতে চাই তোমার সেই নাচ। তোমার সেই নৃত্য পটীয়সী ভঙ্গী দেখে আমি নূতন করে সৃষ্টি করতে চাই ভারতীয় নৃত্যকলার ও কারুশিল্পের কিছু নিদর্শন। আসবে তুমি রোজ আমার কাছে? কথা দাও লতা।

লালি ঠিক বুঝতে পারে না দেবব্রত কি চায় তার কাছ থেকে। শুধু তাকে দিনান্তে একটি বার সে দেখতে চায়। আঁকতে চায় তার ছবি অথচ আর কিছুই সে চায় না তার কাছ থেকে। এ কি অদ্ভুত প্রস্তাব নারীর কাছে নরের। তবে বুঝি এ শুধু মিথ্যা বিড়ম্বনা। বড় লোক গরীবকে হেয়জ্ঞান করেই বুঝি কিনে নিতে চায় তার সমস্ত উপসত্বটুকু। অভিজাত উচ্চ বংশ বলে এখনও নীচ জাতের প্রতি এ কি হেয় কটাক্ষপাত!

লতার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। সে বলে-আজ আমি যাই বাবু। আপনার কথা আমি ভেবে দেখব। তবে এ কথা মনে করবেন না যে আমরা গরীব বলে রূপ-যৌবন বা দেহ বিক্রী করতেই অকারণে বড়লোকের দোয়ারে এসে ধর্না দিচ্ছিলাম। আপনি শিল্পী, আমিও শিল্পকে শ্রদ্ধা করি। আমি তারই যোগ্য মর্যাদা প্রার্থনা করি আপনার কাছ থেকে। আর এই মোহেই আমার মন অকারণে এখানে ছুটে আসতে চায়। আজও তাই এসে পড়েছি। আমার অন্যায় ক্ষমা করবেন। আর আপনি যে বন্ধুত্বের কথা বলছেন, আমার তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই পল্লী সমাজের কঠোর শাসন দন্ড যদি না উদ্যত হয়ে থাকত। আমি যাই বাবু।

দেবব্রত তবুও বলল — লতা তুমি আমায় ভুল বুঝো না, শুধু এইটুকুই বললাম।

— লালি চলে গেল। দেবব্রত বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে লালির চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

দশ

মৃন্ময়ীদেবী তন্ময় হয়ে দেবব্রতের মুখ থেকে নেপাল মহারাজের বাড়ীতে তাকে কেমন করে ছবি আঁকতে হয়েছিল তা শুনছিলেন। দেবব্রতের বন্ধু সরোজেশ ব্যানার্জ্জী এসে ড্রইং রুমে প্রবেশ করে বলল — হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, গুডমর্ণিং, গুডমর্ণিং মাম।

— হ্যালো - আরে সরোজেশ তুই? কি সৌভাগ্য আমার। আয় আয় — বলে দেবব্রত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ছুটে গিয়ে সরোজেশকে জড়িয়ে ধরল।

টুপিটা মাথা থেকে খুলে একটা সোফার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরোজেশ বলল — দেখুন ত মা কি কাণ্ড একবার। আরে ছাড়্ ছাড়্। তারপর আর সব খবর কি বল। কেমন আছিস। কেমন শিল্প সাধনা হচ্ছে তোর এই পল্লীর ছায়া ঢাকা বনের মধ্যে বসে। নিশ্চয়ই মারর্ভেলাস্?

দেবব্রত সরোজেশকে ছেড়ে দিয়ে বলল — তা মারর্ভেলাস্-ই বলা চলে। সত্যি যা পরিবেশ আমি পেয়েছি তা দেখলে তোর হিংসে হবে একথা নিশ্চয়ই করে বলতে পারি। চল্না তোকে আগে আমার স্টুডিওটা দেখিয়ে আনি।

ক্যামেরাটা গলা থেকে খুলে দেওয়ালের একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখে সরোজেশ বলল — নাঃ ভাই, এখন আর পারছি না। তাছাড়া দেখলেই যখন হিংসে হবে তখন বরং থাক্ তোমার ও স্টুডিও দেখা। কি বলুন মা। কিন্তু মা এই এত দূর পথ একেবারে নিরম্বু আসছি কলকাতা থেকে। নিতান্ত বন্ধুর ডাক্। দেশে ফিরেই যেন ওর সঙ্গে দেখা করি। আমি মাত্র তিনদিন হল ফিরেছি কলকাতায়। এসেই ওর কথাটাই আগে মনে পড়ল, তাই চলে এলাম সটান এখানে। জানেন ত প্যারিসে থাকা কালীন আমরা দুই জনেই কেবল ছিলাম বাঙালী শিষ্য। বলে, সরোজেশ হাসতে লাগল।

মৃন্ময়ীদেবীও মৃদু হেসে বললেন এসব আমি শুনেছি সবই ওর মুখ থেকে। তুমি ছিলে বলেই ও তবু দু'টো কথা বলে থাকতে পেরেছে, না হলে যে কি করত কে জানে।

সরোজেশ বলল — হ্যাঁ বলছিলাম কি, সত্যি মা ট্রেন জার্নি করে ক্ষিদেয় নাড়ী ছিড়ে যাচ্ছে। কিছু খাবার ব্যবস্থা করুন আগে।

মৃন্ময়ীদেবী উঠে বললেন — ওই দেখেছ আমি একেবারে ভুলে গেছি — হ্যাঁ তুমি কি একেবারে স্নান সেরে নেবে সরোজ, দেখ তা হলে বাথরুমে জলের ব্যবস্থা করিয়ে দিই আগে।

— সেই ভাল মা। একেবারে স্নান সেরে ফ্রেস হয়ে ফ্রেস এনার্জি নিয়ে কাজ আরম্ভ করাই ভাল।

দেবব্রত অবাক হয়ে বলল — সে কি! কি কাজ করবি রে তুই এখানে?

— কেন পল্লী ভ্রমণ। তোর স্টুডিও দর্শন তারপর ছবি অঙ্কন।

দেবব্রত হেসে বলল — প্যারিসের মত সৌন্দর্যশালী দেশ ছেড়ে এসে এই বাংলার কুখ্যাত পল্লী ভ্রমণটা কি খুব ভাল লাগবে বন্ধু। তবে আমার স্টুডিওটা তুমি দেখতে যেতে পার।

— উঁহু, ওসব শুনছি না বন্ধু। ও দু'টোই দেখব এবং তা আজই।

মৃন্ময়ীদেবী হেসে বললেন — অত তাড়া কেন বাবা। এসেছ যখন, তখন দু'টো দিন থাক। তারপর ধীরে সুস্থে সব দেখো। শোন, তুমি এখন ওঠো, এসো তোমায় বাথরুমটা দেখিয়ে দিই।

— সেই ভালকথা মা। তবে একটা কথা — ও দু'টো দিন থাকা হবে না মা আমার। খুব জোর কালকের দিনটা থাকতে পারি। পরশু আমায় কলকাতা ফিরতেই হবে। আমায় অনুরোধ করবেন না দয়া করে।

মৃন্ময়ীদেবী হেসে বললেন — বেশ ত কালকের দিনটাই কাটুক তারপর দেখা যাবে। ছেলে যেন এসেই একেবারে যাবার জন্যে অস্থির। কেন ঘরে কি বউ ফেলে এসেছে নাকি?

সরোজেশ মৃন্ময়ীদেবীর পশ্চাদানুসরণ করে হেসে বলল — না মা তা ফেলে আসিনি। কিন্তু মা, সত্যি একটা এন্‌গেজমেন্ট আছে।

মৃন্ময়ীদেবী হেসে বললেন — আচ্ছা আচ্ছা, তাই যাবে।

স্নানাদি সেরে সরোজেশ এসে দেবব্রতের পাশে বসে হাসতে হাসতে বলল — তারপর কি খবর বন্ধু। বল কেমন আছিস্? তারপর কিছু নতুন ছবি টবি আঁকলি নাকি?

দেবব্রত বলল — তা অবশ্য দু'একটা এঁকেছি। কিন্তু সব থেকে মজার আঁকা যা হল না এই একটা মাস ধরে। শুনলে তোর হাসি পাবে।

— হাসি পাবে? কেন রে, কি ব্যাপারটা কি শুনি?

দেবব্রত সব খুলে বলল — নেপাল মহারাজের বাড়ী থেকে ছবি আঁকার ডাক এসেছিল। সেখানে গিয়ে আঁকতে হবে। শুধু আমাকে একলা ডাক পড়েনি ভারতের যত খ্যাতনামা শিল্পী আছে — সকলকারই ডাক পড়েছিল।

— তারপর, তারপর —?

— তারপর আর কি। গেলাম সেখানে। সে এক মজার দৃশ্য। রাজ দরবারে সারি সারি শিল্পীর দল বসেছে ছবি আঁকতে। রাজা দরবারের মধ্যে দিয়ে সারাদিন ধরে পায়চারি করত আর একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরে ফিরে তাকাত। লক্ষ্য করত কে কেমন ছবি আঁকছে।

— আচ্ছা পাগলা রাজা ত।

— আরে পাগলা বলে, পাগলা। সারাদিনে এতটুকু বিশ্রাম পর্যন্ত নিত না কেবল খাওয়ার সময় ছাড়া। সময় সময় এক — এক জনের ছবির দিকে ঝুঁকে পড়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কখনও কখনও বলত বাঃ বাঃ, বহুত আচ্ছা। বহুত খুবসুরত বানতা হ্যায়।

— তারপর

— তারপর এমনি করে পুরো একটা মাস চলল এই ছবি আঁকার কসরত। ছবির অর্ডার হয়েছিল মোট আড়াইশো। শিল্পীও গিয়েছিল মন্দ নয়। তা জনা পঁয়ত্রিশ হবে। বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিল মোট এগার জন। বাকী সব হিন্দুস্তানী, গুজরাটী, মাদ্রাজী ইত্যাদি নানান দেশের শিল্পী।

— তারপর বল, ছবি আঁকা কাদের ভাল হল? কারা বেশী সম্মান পেল?

দেবব্রত বলল — সম্মানটা অবশ্য বাংলাই একচেটিয়া করে কুড়িয়ে নিয়ে এল মহারাজের দরবার থেকে। সত্যি অনান্য শিল্পীদের জন্য দুঃখ হয়। আহা বেচারীরা অত মেহনত করল কিন্তু শুধু দাম ছাড়া তারা কোন পুরস্কারই পেল না। তবে হ্যাঁ, একজন মুসলমান শিল্পী এসেছিল লক্ষ্মৌ থেকে। হ্যাঁ ভাই, তার ছবি আঁকা দেখলাম। সত্যি অপূর্ব। সে পুরস্কার পাবার সত্যিই যোগ্য অধিকারী। অবশ্য পেয়েওছে দু'টো পুরস্কার।

সরোজেশ জিজ্ঞাসা করল কি ছবি এঁকেছিল সে শিল্পী?

— একখানা এঁকেছিল শাজাহানের স্বপ্ন। আর এক খানা এঁকেছিল তাজমহল নির্ম্মাতা মুসলমান শিল্পী সিরাজের ভালবাসা।

— তাতে সে কি দেখিয়েছে?

— দেখিয়েছে মমতাজ একটা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়ে আছে আর নীচে সেই মুসলমান মিস্ত্রী তার মানসী প্রিয়াকে প্রাণভরে দিনান্তের একটিবারের দেখা দেখছে। বাস্তবিক ব্যাপারটা আমিও জানতাম না। পরে ঐ মুসলমান শিল্পীর কাছ থেকে আরও জানলাম যে মমতাজকে নাকি ঐ মিস্ত্রী খুব ভালবাসত। আর সে অত বেশী করে ভালবাসত বলেই অত সুন্দর করে তৈরী করতে পেরেছে এই তাজমহলের নক্সা। সম্রাট শাজাহানও নাকি জানতেন মিস্ত্রীর ঐ গোপন প্রেমের কথা। তাই তিনি নাকি এক সময় দুঃখ করে বলেওছেন যে মমতাজকে আমি কি ভালবেসে গেলাম, আমার চেয়ে যে বেশী ভালবেসেছে সেই তৈরী করে রেখে গেল এই শুভ্র তাজমহল। যা যুগ-যুগান্ত, অনাদিকাল ধরে - পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থেকে প্রমাণ করবে এই গভীর ভালবাসার কথা। সম্রাট মিস্ত্রীর এই ভালবাসার কথা জানতে পেরে মমতাজকে অনুরোধ করেছিলেন দিনান্তে একবার যেন এই মিস্ত্রীকে তিনি দেখা দেন। মমতাজ সম্রাটের সে আদেশ অনুযায়ী সত্যই নাকি তাকে দিনান্তে একটিবার দেখা দিত। আর সেই শিল্পী-মিস্ত্রী দু'হাত উর্দ্ধে তুলে আল্লার নাম স্মরণ করে তার মানসপ্রিয়াকে বলত — তোমাকে দূর থেকে দেখেই আমি তৃপ্ত আমি খুশী। আমি আল্লার কাছে এই প্রার্থনাই করি তোমাকে তিনি যেন আরও ঐশ্বর্য্যময়ী করেন আরও রূপবতী করেন। এই ছবিটাই এঁকেছিল লাক্ষ্মৌ এর সেই মুসলমান শিল্পী। বাস্তবিক ওয়ান্ডারফুল হয়েছে তার এক্সপ্রেশান্।

সরোজেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল ছবির আইডিয়াটা সত্যিই ভাল। যাক্ তারপর তুই কি পেলি বল। কিছু পেয়েছিস ত বটে?

তা অবশ্য পেয়েছি। আর তা একটা—আধটা নয়, চার—চারটে। আর সব ক'টাই সোনার ওপর কারুকার্য্যকরা। তোকে স্টুডিওতে গিয়ে দেখাব'খন।

কনগ্রাচুলেশন্ মাইডিয়ার ফ্রেন্ড। কন্‌গ্রাচুলেশন্ ফর্ ইওর গুড্ লাক্। বলে সরোজেশ লাফিয়ে উঠে দেবব্রতের হাত ধরে বার বার ঝাঁকানি দিয়ে আরও বলল নাঃ তুই দেখছি সত্যি একটা এ্যাডভেঞ্চার করে এলি। যাক্ তারপর আর সব খবর কি বল। কিন্তু হ্যাঁ আমায় এবার একটা সাইট ঠিক করে দে কোথাও। ভেবেছিলাম সিনেমা লাইনে ক্যামেরাম্যান হয়ে ঢুকব। চান্স-ও এসেছিল, কিন্তু তুই যা লোভ দেখাচ্ছিস।

মৃন্ময়ীদেবী এলেন। সঙ্গে ভজ আর নতুন ভৃত্য রামা এল হাতে খাবারের প্লেট-ডিশ নিয়ে।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন রাখনা সব ওই টেবিলে। রাখ্ রাখ্। হ্যাঁ, যা এবার

দু'গ্লাস জল নিয়ে আয়।

ভজ আর রামা চলে গেল।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন — কই বাবা সরোজ, — নাও দেখি আগে খেয়ে নাও। এসো, গল্প পরে করো।

সরোজেশ সরে এসে খেতে বসল। ওঃ তুইও বুঝি এখনও খাস্‌নি। যাক্ ভালই হল। দু'বন্ধুতে অনেক দিন খাই-ও নি। আবার খাওয়া গেল।

দেবব্রত খেতে বসে বলল — তারপর কি করবি খেয়ে-দেয়ে। চল্‌না আমার স্টুডিওটা ঘুরে আসবি। বেশী দূর ত নয়। এই মাইল দু'য়েক হবে এখান থেকে।

— যেতে আমার আপত্তি নেই, তবে ভাই হাঁটতে আমি পারব না। সাইকেল আছে ত?

— তা আছে। কিন্তু তার দরকার কি। বাড়ীতে ত ফিটন রয়েছে। ওতেই যাব। আর আমি ত ওতে করেই যাওয়া-আসা করি। ওরে ও রামা — দেবব্রত রামাকে একটা হাঁক দিল।

রামা এসে দাঁড়াল।

দেবব্রত বলল — ওরে রামা, কোচোয়ানকে ফিটনটা বার করতে বল্। বল্ ছোটবাবু আসছে। এখনি, যা —

রামা চলে গেল।

সরোজেশ খুঁটিয়ে সব কিছু খেয়ে গ্লাসের জলটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল — আঃ, এতক্ষণে পেটের জ্বালাটা একটু কমল। আচ্ছা তাহলে এবার ওঠা যাক কি বলেন মা। ও যখন বলছে তখন একবার ঘুরেই আসি ওর স্টুডিওটা। কিন্তু মা দুপুরে ফিরে আমি খাওয়া দাওয়া সেরে একটু পল্লী দেখতে বেরুব।

— বেশ ত তাই যাবে। তাতে আর আপত্তির কি আছে। ঘুরে এস সকাল সকাল। মৃন্ময়ীদেবী বললেন।

— কইরে ওঠ। বসে রইলি যে এখনও। বলে সরোজেশ রুমালে হাত মুখ মুছে হ্যাঙার থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে টুপিটা মাথায় চড়িয়ে নিয়ে বলল — নে, চল। দেরী করিস না।

দেবব্রত উঠে বলল — চল্। কিন্তু তোর দেখছি সেই তাড়াহুড়ো ভাবটা

এখনও গেল না। আচ্ছ মা, আমরা তবে একটু ঘুরে আসি। ও যা পাগল, জিদ ধরেছে যখন, তখন ঘুরিয়ে এনে আবার বিকালে একটু ঘোরাতে নিয়ে যেতেই হবে।

মৃন্ময়ীদেবী হেসে বললেন — এস।

দেবব্রত ও সরোজেশ এসে ফিটনে উঠল। কোচোয়ান জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাব বাবু?

— কোথা আবার। স্টুডিওতে চল সোজা।

কোচোয়ান তার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

এগার

বিকালের চা-পর্ব শেষ করে দেবব্রত মৃন্ময়ীদেবী এসে বলল — যাই মা, ওকে একটু তালুক ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ও ত আবার কালই চলে যাব যাব করছে।

— সে কি করে হয় বাবা। এলে যখন, তখন দু'টোদিন না থেকে কি করে যাবে। সে হবে না। আমিও ত মা হই, না হয় একটা দিন জোর করেই থাকবে মায়ের অনুরোধে।

সরোজেশ এবার ম্লান হেসে বলল — বেশ ত মা, আপনি যখন বলছেন- তাই হবে। আমি কালকের দিনটা থেকেই যাব। তবে আজ কিন্তু এ দিকটা একটু ঘুরে আসি।

— তা এস গে।

দেবব্রত বলল — যাক্ ভালই হল, আমারও ত ওদিকে পদার্পণ নেই। তোর দৌলতে আমারও তালুক দেখার কাজেও হাতেখড়ি হবে। বাবাকে নেপাল যাবার আগে কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে একটু করে জমিদারির কাজে মন দোব।

— তাই নাকি! ব্রেভো। তা বেশ ত, তা হ'লে বল আমি তোর জীবনের সব থেকে বড় দু'টো অংশেরই পথপ্রদর্শক।

নিশ্চয়ই! পাইওনিয়ার বলা চলে। তারপর কোন দিকে যাবি বল।

— ও সব আমি দিক-টিক জানি না ভাই। ও তুমি বোঝ। আমার উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম যে কোন একটা দিক হলেই হ'ল। বলে সরোজেশ তার

ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। আরও কয়েকটা কাগজের বান্ডিল ও একটা পাতলা আউটডোর ড্রইং বোর্ড ইত্যাদি যা কিছু সে দেবব্রতের স্টুডিও দেখতে গিয়ে নিয়ে এসেছিল সেগুলোও একটা ঝোলা ব্যাগে ভরে নিয়ে অপর কাঁধে ঝোলাল। ইচ্ছা যদি তেমন কিছু নজরে আসে হাতেও স্কেচ করবে।

দেবব্রত বলল — ও ঝোলাটা বরং আমায় দে। তোর ত কাঁধে একটা রয়েছে। দরকার পড়লে নিস্।

— বেশ তাই নে। বলে সরোজেশ কাঁধ থেকে ঝোলা ব্যাগটা খুলে দেবব্রতকে দিল।

রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদ এসে ঢুকলেন ড্রইং রুমে।

মৃন্ময়ীদেবী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিলেন। রায়বাহাদুর বললেন তোমরা যাচ্ছ যাও কিন্তু জনকতক পাইক সঙ্গে নিয়ে যাও।

দেবব্রত মুখ তুলে তাকাল।

রায়বাহাদুর বললেন — তালুকের দিকে ত কখনও পা বাড়াও নি, ওরা সঙ্গে থাকলে তবু একটু আধটু চিনিয়ে দিতে পারবে।

দেবব্রত বলল — কি দরকার বাবা আজ না হয় থাক না। সে অন্য আর এক দিন গেলেই হবে। কোচোয়ান ত রাস্তা ঘাট সবই চেনে। ওই সাহায্য করবে।

রায়বাহাদুর বললেন — বেশ ত সে তুমি যেও পরে। কিন্তু সঙ্গে দু'জন অন্ততঃ লোক নিয়ে যাও। পথে বিপদাপদও ত আছে।

দেবব্রত আর কোন কথা বাড়াল না।

রায়বাহাদুর সদরে এসে দরোয়ানকে ডেকে হুকুম করলেন — ভকত সিং জলদি দু'জন পাইককে এদের সঙ্গে যেতে বলে দে। ওরা তালুক ঘুরতে যাবে।

ভকত সিং মস্ত সেলাম ঠুকে বলল — যো হুকুম সাব।

দেবব্রত ও সরোজেশ এসে ফিটনে উঠল।

দু'জন পাঠান্ পাইক এসে ফিটনের পাদানীতে দাঁড়াল। কোচোয়ান পায়ে করে ফিটনের ঘন্টাটা একবার চেপে ধরে বাজিয়ে ঘোড়ার পিঠে একটা মৃদু ছড়ির আঘাত করল।

ফিটন ছুটতে লাগল।

জমিদার বাড়ীর ফটক পেরিয়ে ফিটন গ্রাম্য-কাঁচা রাস্তা ধরে পথ চলতে

শুরু করল।

তারা শীঘ্রই এসে বড় রাস্তায় পড়ল। পিচ্ ঢালা পাকা রাস্তা। রাস্তাটা সোজা কোপাই নদীর ধার বয়ে পশ্চিমে আহ্‌মদ্‌পুর ছাড়িয়ে চলে গেছে।

দেবব্রত আর সরোজেশ বসেছে সামনা সামনি। গাড়ীর তালে তালে তারা দুলতে দুলতে চলেছে। সরোজেশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে পল্লী বাংলার দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চলেছে। সে শহরের ছেলে। জন্মেছেও শহরে। বড় হয়েও সে বিশেষ পল্লীগ্রাম ভ্রমণে এমন করে বার হয় নি। প্যারিসে গিয়ে *Rural Village* গুলো সে দেখেছে বটে কিন্তু বাংলার এই পল্লীর সাথে তার অনেক প্রভেদ। এখানকার মাঠে কৃষাণরা, যেমনটি করে সঙ্গে দল বেঁধে গান গাইছে, ধান কাটছে, কাজ করছে, ওদের দেশে সে ঠিক তেমনটি কিন্তু দেখেনি। কোথায় যেন এতটুকু অসামঞ্জস্য; অথচ সেও পল্লী আর এও পল্লী। দেবব্রতের জন্ম এই পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামেই সে আশৈশব মানুষ। তবে বড় হবার পর সে গিয়ে কলকাতার বোর্ডিংএ থেকে বি. এ. পরীক্ষা আর আর্টস এর পরীক্ষাটা দিয়েছিল। সে পল্লীর প্রকৃত রূপ সবই জানে। কেমনতর এদেশের লোক, কি করে এদের পেট চলে; কেমন সরল সুন্দর স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে ওরা, তা সবই দেবব্রতের জানা। সে তারই গল্প করতে করতে চলেছে।

— ওই দেখ্ এখানকার চাষীরা কেমন বাঁকে করে ধান নিয়ে যাচ্ছে। ওই শোন কেমন ঝম্ ঝম্ শব্দ হচ্ছে ধানের বোঝার।

সরোজেশ ফিটনের উপর দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর তার ক্যামেরাটা খুলে তরিতে ফোকাস ঠিক করে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আরও একদল লোক ধানের বোঝা বাঁকে করে নিয়ে ফিরছে। সরোজেশ তাদের একটা ছবি তুলল। তারপর নিজের জায়গায় বসে বলল -- সত্যি আমার খুব ভাল লাগছে তোদের এই গ্রামটা দেখে। তোর স্টুডিও পরিবেশ থেকে আরম্ভ করে গ্রাম্য পরিবেশ যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

দেবব্রত বলল এখনও ত কিছুই দেখিস নি। চল তোকে সাঁওতাল পল্লীটা দেখিয়ে আনি। দেখবি তাদের গ্রাম্য স্বাস্থ্য সৌন্দর্য। তাদের সরলতা।

— তুই কি সেইখানেই চলেছিস নাকি?

— হ্যাঁ এই পথে যেতে ওদের গ্রামের ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

সরোজেশ তার ক্যামেরার ফিল্মের নম্বরটা ঘুরিয়ে ঠিক করে রাখল।

ফিটন চলেছে।

বড় রাস্তার ওপর একটা কাঠের পুল ছিল। সেটা কবে যেন ভেঙ্গে গেছে। পথটা তাই বেঁকিয়ে নিতে হয়েছে। বাঁ পাশে একটা ছোট সাঁওতাল পল্লী। একটা কাঁচা রাস্তা তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। কোচোয়ান তার গাড়ীকে সেই পথেই নামিয়ে চলল। একটু গেলেই আবার এই বড় রাস্তায় ওঠা চলবে।

— দূরে গ্রামের ভিতর সাঁওতালদের মাদল বাজছে। সরোজেশ জিজ্ঞাসা করল — ও কিসের শব্দরে দেবব্রত?

— মাদলের।

— সে কি?

— এক রকম সাঁওতালী বাদ্য। কেমন বাজছে শোন্ না।

— শুনছি ত। বেশ বাজাচ্ছে। বেশ মিষ্টি সুর।

কোচোয়ান বলল — সুজ্জু ত ডোবে ডোবে। আর গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে বাবু।

দেবব্রত কি চিন্তা করল। একবার পশ্চিম আকাশটার দিকে তাকিয়ে বলল — নাঃ এখনও বেলা আছে। আচ্ছা কোচয়ান তুমি এইখানেই গাড়ী থামাও। আর গিয়ে কাজ নেই। বরং আমরা একটু পায়ে হেঁটে এই গ্রামের ভেতরটা দেখে আসি। চল রে সরোজ —'

সরোজেশ নেমে এল ফিটন থেকে। দেবব্রতের সঙ্গে সে হেঁটে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করল।

মাদলের শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। সেই সঙ্গে অসংখ্য সাঁওতাল সাঁওতালীর আনন্দ মুখরিত কলকণ্ঠ।

দেবব্রত বলল — নিশ্চয়ই সাঁওতালদের নাচ হচ্ছে আজ। তোর ভাগ্য ভাল বলতে হবে সরোজেশ। যাক্ তোকে দেখাতে পারবো ওদের নাচ।

সরোজেশ হাসল।

ওরা এগিয়ে চলেছে।

সাঁওতাল পাড়ায় আজ সর্দারের মেয়ে মুঙ্গলীর বিয়ে হচ্ছে। সারাদিন ধরে চলেছে উৎসব। সারারাত চলবে। কত নাচ গান আনন্দে হৈ-হল্লোড়, তার আর শেষ নেই।

সরোজেশ থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল — ও কি! ওই পুকুরটায় কি করছে ওরা?

দেবব্রত বলল চুপ। শুধু দেখ দাঁড়িয়ে।

সামনের গাছপালায় ঘেরা পুকুরটাতে দু'জন জোয়ান সাঁওতাল জলে দাঁড়িয়ে জল তোলপাড় করছে। যেন দুই মত্ত বন্য হস্তী, জলে পড়ে গিয়েও তাদের মল্ল যুদ্ধ ত্যাগ করেনি। কে কাকে হারাতে পারে এ যেন তারই একটা পরীক্ষা চলেছে। দু'জনেই সমান বলশালী। একজন অপর জনকে যদিও খানিক ক্ষণের জন্য জলের মধ্যে চেপে ডুবিয়ে রাখছে কিন্তু পরমুহূর্তে সে উঠে প্রথম জনকে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করে জলের ভিতর চেপে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। এইভাবে চলতে লাগল হারজিতের পালা। উপরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দলবদ্ধ জোয়ান জোয়ানীরা সোৎসাহে চিৎকার করছে, বাহবা দিচ্ছে। কখনও বা আবার হতাশায় নীরব হয়ে পড়ছে। একদল ক্রমাগত মাদল বাজিয়ে চলেছে। এবুঝি কোন্ নুতনতর রণ দামামা।

সরোজেশ জিজ্ঞাসা করল — কি হচ্ছে রে ওখানে, আমি ত এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। ও দু'টো জোয়ান সাঁওতাল কেনই বা জলের মধ্যে অমন করে মারামারি করছে, আর কেনই বা ওরা এদের দেখে মাদল বাজাচ্ছে, আনন্দ করছে?

দেবব্রত হেসে বলল — নিশ্চয়ই কোন সাঁওতালের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। ওদের বিয়েতে এটা একটা প্রধান অঙ্গ। দু'জন অবিবাহিত জোয়ান সাঁওতাল ঠিক করা হয়। পরে এদের ঐ জলের মধ্যে নামিয়ে মল্লযুদ্ধ করতে দেওয়া হয়। এই দু'জনের মধ্যে যে অপর জনকে বেশ খানিকক্ষণের জন্য জলের মধ্যে চেপে ধরে রাখতে পারবে সেই সব থেকে বেশী বলবান প্রতিপন্ন হবে। আর সেই পরবে বিজয় তিলক। সে-ই স্বয়ম্ভর জিতে বিয়ে করার যোগ্য অধিকারী হবে।

পুকুরের পাড়ে দন্ডায়মান সাঁওতালের দল হঠাৎ আনন্দ দ্বিগুণ জোরে উল্লাস প্রকাশ করে চিৎকার করে উঠল। আর সেই সঙ্গে তাদের হাতের মাদল শতগুণ হয়ে বেজে উঠল।

কে একজন পালোয়ান ছুটে গিয়ে ওই দু'জন যোদ্ধার মধ্যে বিজেতাটিকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে উপরে উঠে এল।

দেবব্রত বলল — ওই দেখ্, ওই ছেলেটি জিতল। তাই ওকে নিয়ে ওরা অমন করে নাচতে শুরু করেছে। এইবার দেখবি ওকে ওরা সাজাবে, বরাসনে বসাবে তারপর যথারীতি ওদের মতানুযায়ী বিয়ে-থা হবে।

— আর ও ছেলেটার কি হবে, যে হেরে গেল?

— কি আর হবে, আবার ওকে অপেক্ষা করতে হবে অপর কোন মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত। তখন যদি ও পারে এইভাবে জিততে, ও তখন বর হয়ে বিয়ে করতে পারবে।

সাঁওতালগুলো নাচতে-নাচতে পুকুরধার থেকে চলে গেল।

দেবব্রত আর সরোজেশও সেই সঙ্গে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

পাড়ার সব জোয়ান আর জোয়ানীরা এবার এসে একসঙ্গে দু'টি দলে ভাগ হয়ে কোমর ধরাধরি করে নাচতে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে গাইতে লাগল ও দিককার ফর্সা উঠোনটায়। অদূরে দাঁড়িয়ে জন চারেক মরদ তালে তালে নেচে নেচে মাদল বাজাতে লাগল। কে একটা বাঁশের বাঁশীও বাজাচ্ছে। সর্দারের বাড়ির চত্তর উঠোনটার চারিদিকে বড় বড় শাল আর আম কাঁঠালের গাছে ঘেরা। চক্-চক্ করছে পরিষ্কার উঠোন। সেই উঠোনেই মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে নাচছে আর গাইছে।

উঠোনের সামনে তিন দিক ঘিরে সর্দারের বাড়ী। বাড়ীতে মাটির রোয়াকে বসে আছে কতকগুলো বুড়ো আর বুড়ীর দল। ওরা আর নাচতে টাচতে পারে না। ওরা এখন সমঝদার দর্শক। উঠতি বয়সের ছুঁড়িদের সংখ্যাও অল্প নয়। এদের জন্য ওরা - ও নিশ্চিন্ত। বরং বিয়ের অনান্য কাজগুলো ওরা একটু আধটু দেখছে। আর মাঝে মাঝে এসে রোয়াকে বসছে।

মাদল বাজচ্ছে দীপাং-দীপাং-দীপাং-দাং। দাং-দীপাং-দীপাং-লো, হুর-র-রে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে আর পুরুষগুলো ঝুঁকে পড়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচছে আর হাততালি দিচ্ছে।

বাঁশের বাঁশীর সুরটা মাদলের সঙ্গে মিলছে ভাল।

সরোজেশ আর দেবব্রত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচ দেখতে লাগল।

তখনও খানিকটা সূর্যের আলো ছিল।

সরোজেশ তার ক্যামেরার লেন্সটাকে এ্যাড্যাষ্ট করে নিয়ে ওদের নানা ভঙ্গীর ছবিতুলতে লাগল। দেবব্রত দাঁড়িয়ে বন্ধুর ছবি তোলা দেখতে লাগল আর মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। — কি রে কেমন লাগছে? কেমন বলত এদের জীবন। বলেছিলাম কি না যে আমি সত্যিকার একটা ভাল পরিবেশ পেয়েছি।

সরোজেশের প্রথম ফিল্মটা ফুরিয়ে গেল। সে আর একটা ফিল্ম লোড করে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিল তা সত্যি। আমার হিংসে হবারই কথা বটে।

সরোজেশ আবার তার ক্যামেরায় ফোকাস্ করল।

দেবব্রত বলল — দেনা আমায় একবার। তুই-ই কেবল ছবি তুলবি। তার চেয়ে বরং একটু স্কেচ কর দাঁড়িয়ে !

সরোজেশ বলল — না-রে-না। দাঁড়া তুই।

দেবব্রত হাসল।

সরোজেশ হাঁটু গেড়ে বসে ছবি তুলছিল। কিন্তু এ কি। ওরা ত আর নাচছে না। কি হল ওদের উঃ —।

সরোজেশ তার হাতে লাঠির আঘাত পেল। সেই সঙ্গে ক্যামেরাটাও ছিটকে এক পাশে পড়ে গেল।

হাঃ - হাঃ - হাঃ, শয়তান। বেয়াকুব।

কয়েকজন সাঁওতাল হাতে লাঠি নিয়ে তাদের ঘিরে ধরে অট্টহাস্য করতে লাগল।

শয়তান, হারামজাদা কোথাকার।

আর একজন লাঠি তুলল দেবব্রতর মাথা লক্ষ্য করে।

দেবব্রত শিউরে উঠে মাথায় হাত দিল।

ঠক্ ঠক্।

দু'টো লাঠিতে বাধা পেল।

রায়বাহাদুরের পাঠান পাইকের লাঠি দেবব্রতের মাথা রক্ষা করল বটে, কিন্তু সে পড়ে গিয়ে মাথায় ভীষণ চোট পেল। সে জ্ঞান হারাল। সরোজেশ ইতিপূর্বেই জ্ঞান হারিয়েছে।

লাঠিতে লাঠিতে বাধা পাওয়াতে সাঁওতালের দল ছুটে এল। হৈ হৈ চিৎকারে আকাশ বাতাস ভয়ার্ত হয়ে উঠল। তাদের মুখ থেকে কেবল শব্দ উঠল মার্, দুষ্মণকে মার্।

দ্বিতীয় পাইকের হাতে বন্দুক ছিল। সে অদূরে দাঁড়িয়ে শূন্যে একরাউণ্ড গুলি করল। আরও-আরও এক রাউণ্ড।

উন্মত্ত জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

তাদের অগ্রগতিতে বাধা পেল। কি হল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে তারা হতচকিত হয়ে এ ওর মুখ পানে তাকাতে লাগল।

দ্বিতীয় পাইক বন্দুকটা উদ্যত করে গম্ভীর স্বরে বলল — তোরা হাতিয়ার ফেলে দে সর্দার। নইলে মরবি সব গুলি খেয়ে। এ তোরা করেছিস কি। তোরা ছোটবাবুর মাথায় লাঠি মেরেছিস্?

সর্দার ত অবাক!

সর্দার চিৎকার করে কেঁদে উঠল। এ্যাঁ বলিস কিরে তুই। আমাদের রাজাবাবুর লেড়কা। ছোটবাবু। ওরে তোরা করলি কিরে। ফেল্ ফেল্ লাঠি ফেলে দে। জল আন শিগ্গীর।

সকলে ছুটল জল আর হাত পাখা আনতে।

মেয়েদের দল এসে জমায়েত হল। সর্দার নিজে হাতে করে দু'বাবুকে ঝোপের মধ্যে থেকে তুলে এনে তার উঠানে চাটাই পেতে শুইয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল। তাদের ক্ষত স্থান হতে রক্ত বন্ধ করতে নানান গাছ পাতা এনে কেউ বেঁটে বসিয়ে দিল।

কিন্তু সর্দারের আর কান্না থামে না।

আজকের দিনে এ তোরা করলি কিরে। ওরে এ যে আমাদের গোরাবাবু রে। আমাদের ছোট মুনিব হয় রে। আমি বড় মুনিবকে মুখ দেখাব কি করে।

কে একজন বলল — তা আমরা কি করে জানব বল্ দেখি। ওরা দু'জনে বনের মাঝে চুপি চুপি মায়াছানার ফটো খিঁচছিল আর হাঁসাহাঁসি করছিল। উদিনে ক'টা সাহেববাবু এসে ওই রকম করে আমার বউয়ের ফটো খিঁচে নিয়ে গেছেক। তাই ত মোর বড় রাগ।

বউ ঘাটে নাইতে লেবেছে আর সাহেব দু'টো পথ দিয়ে যাচ্ছে কেনে সাইকিলে করে। দেখতে পেয়ে ওমনি চট করে ছবি উঠিয়ে লিয়েছে। সে রাগ আমার যায় নে কেনে। আর উরাই ত আমাদের মায়াছানার ফোটো তুলে লিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রী করবেক্।

— তুই চুপ কর দিকি বেঁলিয়া। তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি ম'লে হবে। যা তুই এবার বাবুর বাড়ী গিয়ে ঐ কথা বলে আয়। মাথাটা তোর থাকবে কোন খানে দিকি আমি।

পাখার বাতাসে আর জলের স্পর্শে দেবব্রতের জ্ঞান ফিরে এল। সে চোখ মেলে তাকাল। বলল — আমি কোথায়?

সর্দার কেঁদে দেবব্রতের পায়ে পড়ে বলে উঠল — খোকাবাবু তুই

আমাদের বাড়ীতে কেনে। আমরা তোকে মেরে দিয়েছি কেনে ভুল করে। আমাদের তুই ক্ষমা কর গোরাবাবু। নইলে কর্তাবাবু আর আমাদের মাথাটা রাখবে না।

দেবব্রত একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। লাঠির আঘাতটা সে সামান্যই পেয়েছিল তবে পড়ে গিয়েই বেশী চোট পেয়েছে। মাথাটা এখনও ঘুরছে। আর কাটা স্থানটা দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। দেবব্রত হাত দিয়ে মাথাটা একবার দেখল। দেখল মাথায় একটা ছেঁড়া কাপড়ের ব্যান্ডেজ বাঁধা। সে পার্শ্বে শায়িত বন্ধু সরোজেশের দিকে একবার ম্লান দৃষ্টিতে তাকাল।

সরোজেশের তখনও জ্ঞান ফেরেনি। হাতে কব্জির কাছটা ভীষণ ফুলে উঠেছে। একটা হাত ফেটে রক্ত ঝরছে। সর্দার লতা-পাতার ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু রক্ত পড়া এখনও বন্ধ হয় নি।

দেবব্রত সব বুঝল। সমস্ত স্মৃতি শক্তি তার ফিরে এল। সে দু'জন পাইককে সামনে দেখতে পেয়ে বলল ওকে যাহোক করে তোরা গাড়ীতে তোল। আর আমাকেও একটু ধরে নিয়ে চল। বড় মাথা ঘুরছে।

পাইক দু'জন এগিয়ে এল। কিন্তু ও কাজটুকু আর ওদের করতে হল না। সর্দার নিজেই দু'হাতে করে সরোজেশের শরীরটা তুলে নিয়ে বলল — তোরা গাড়ী করে এসেছিস বাবু? চল বাবু — ওরে এই, তোরা ছোট মুনিবকে ভাল করে ধরে নিয়ে আয় গাড়ীতে।

সর্দার সরোজেশের অচৈতন্য শরীরটাকে কোনমতে ফিটনের পিছনের সিটে শুইয়ে দিল। দেবব্রতকেও বারবার অনুরোধ করে ও পাশের সিটে শুইয়ে দিল। তারপর নিজে দুই সিটের মাঝখানে বসল। আর বসল সেই ছোকরা সাঁওতাল বোঁলিয়া, যে দু'জনকে লাঠির আঘাত করেছে।

কোচোয়ান গাড়ী হাঁকাল তীব্র গতিতে।

সর্দার চিৎকার করে বলল — ওরে মরদ আর জোয়ানীরা তোদের উ সব নাচনা বন্ধ করে সবাই ছুটে আয় বাবুর বাড়ী। সবাই এসে ক্ষমা চেয়ে লিবি। আয় আয়, জলদি করে আয়।

সর্দারের আদেশ সকলের কানে এল।

তারাও ছুটল ঐ গাড়ীর পিছনে পিছনে।

সূর্য তখন পাটে যায় যায়।

ফিটন এসে জমিদার বাড়ীর গেটে পৌছবার আধ ঘন্টার মধ্যেই সাঁওতাল পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই এসে জমায়েত হল।

জমিদার অম্বিকা প্রসাদ চোখ দু'টো আগুনের ভাঁটার মত করে দ্রুত লয়ে কাছারি বাড়ীতে পায়চারি করে ফিরছেন। বুঝি এ কোন আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে চোখে। এ রোষানল থেকে বুঝি আজ আর কারুর পরিত্রাণ নেই।

রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদের গায়ের রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা তোদের! আমার ছেলের গায়ে হাত তুলিস্। আমি তোদের কোন কথা শুনতে চাই না সর্দার। তোদের সব ক'টাকে আজ দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারব।

— মার তুই বড়বাবু। তুই আমাদের সব কটাকে মেরে ফেল। এ মুখ আর আমরা দেখাতে পারব না বাবু। আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে কেনে বাবু। তুই আমায় আগে মেরে ফেল।

সাঁওতালদের মেয়ে-পুরুষ সব এসে কাছারি ঘরে দাঁড়াল।

অম্বিকা প্রসাদ তেমনি অপ্রতিহত গতিতে হাতে দোনলা বন্দুক নিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। একবার মুখ তুলে সকলকে শুধু দেখে নিয়ে ফের ওইভাবে অপ্রতিহত গতিতে কক্ষের এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে পায়চারি করে ফিরতে লাগলেন।

দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী এসে খবর দিল — সরোজেশ বাবুর জ্ঞান ফিরেছে। তিনি উঠে দুধ খেয়েছেন।

— আর দেবব্রত?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিও ভাল আছেন। এই যে তিনি এখানেই আসছেন।

দেবব্রত এসে দাঁড়িয়ে বলল — বাবা আজেকের মত ওদের সবাই কে মাফ্ করুন! ওরা ভুল করে একাজ করে ফেলেছে। ওরা জানত না যে আমরা ওখানে গেছি।

সরোজশের জ্ঞান ফেরার কথা শুনে অম্বিকা প্রসাদ কতকটা আশ্বস্ত হয়ে তার অস্থির পদচারণা বন্ধ করলেন। দেবব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন — বেশ তুমি যখন বলছ তখন ওদের ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সর্দার আর যেন কখনও এ ভুল না হয়। এখানে দশ হাত করে নাকখত্ দিয়ে যা। আর ওকে শাসন করার ভার তোর হাতে ছেড়ে দিলাম। বেশ কড়া করে শাসন করবি বদমাসটাকে।

অন্যান্য মেয়ে-পুরুষগুলোর মুখ থেকে একসঙ্গে ধ্বনিত হল - জয় ছোটবাবুর জয়। জয় গোরাবাবুর জয়। জয় বড় মুনিবের জয়। ভগবান তোদের ভাল করুক।

দেবব্রত এগিয়ে এসে সকলকে বলল - যা তোরা বাড়ী গিয়ে উৎসব করগে যা।

সর্দার ছোটবাবুর পা দু'টো আবার জড়িয়ে ধরে বলল — তোর বন্ধু কেমন আছে রে ছোট বাবু, ভাল হবে ত?

— হবে রে, হবে। ছাড়্, পা ছাড়। কিন্তু কি করলি বলত, ও বাবু কলকাতায় গিয়ে কি বলবে ভাবত। বলবে তোরা এমনি মূর্খ।

সর্দার কাপড়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

কে একজন ভীড়ের ভেতর থেকে এসে সর্দারের হাতে সরোজেশের ক্যামেরাটা আর ঝোলা ব্যাগটা ফেরত দিয়ে বলল — এই নে সর্দার, বাবুদের ক্যামেরা আর থলিয়া দিয়ে দে।

সর্দার সে দুটো গ্রহণ করে — দেবব্রতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল — — আমরা যাচ্ছি কেনে বাবু। কাল সকালে আসব খবর নিতে।

— আচ্ছা আচ্ছা যা।

সকলে চলে গেল।

ব্রজেন চৌধুরী এসে জমিদারের হাত থেকে বন্দুকটা চেয়ে নিয়ে সরিয়ে রাখল।

দেবব্রত ফিরে গিয়ে সরোজেশের পাশে আবার শুয়ে পড়ল।

সরোজেশ একটু ম্লান হেসে বলল — ওরা চলে গেল?

দেবব্রত বলল — হ্যাঁ।

বার

একটু সুস্থ হয়ে সরোজেশ মৃন্ময়ীদেবী, অম্বিকা প্রসাদ ও বন্ধু দেবব্রতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেল।

মৃন্ময়ীদেবী ও অম্বিকা প্রসাদ বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন আরও দুটো দিন থেকে আর একটু সুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আর থাকা চলে না। বিপদে পড়ে এমনিই তিনদিন শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকতে হ'ল। যাবার সময়

সরোজেশ বলল — আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। পারি ত আমি আবার একদিন আসব। কিন্তু মা এখন যাই।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন — আমাদের এখান থেকে একটা বদনাম নিয়ে গেলে বাবা এই দুঃখই আমার বার বার মনে বাজছে।

অম্বিকা প্রসাদও বললেন — হাজার হোক ওরা সেই আদিম জাতির বংশধর। ওদের সেই একগুঁয়ে স্বভাব আর উগ্রতাটা আজও গেল না। যাই হোক্ তুমি যে প্রাণ ফিরে পেয়েছ এতেই আমি খুশি। গিয়ে চিঠি দিও বাবা।

সরোজেশ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মৃন্ময়ীদেবীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে পরে অম্বিকাবাবুর কাছে এসে তাঁরও পায়ের ধূলো মাথায় নিল। — তাহ'লে আমি আসি কাকাবাবু। আবার এতটা পথ যেতে হবে।

— এস বাবা এস।

সরোজেশ চলে গেল। রায়বাহাদুরের ফিটন তাকে নিয়ে বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল।

ফিটন ফিরে এলে দেবব্রতও মৃন্ময়ীদেবীর কাছে গিয়ে বলল — মা আমিও তবে চলি এবার বাগানবাড়ীতে। আর আমিও ত বেশ সুস্থ হয়ে গেছি। কি তাই না?

মৃন্ময়ীদেবী বললেন — কিসের এত তাড়া দেবু। থাক্ না। না হয় আরও দু'টো দিন এখানে। সেই গিয়ে ত কাজ শুরু করবি। মাথার খাটুনিটা দু'দিন বন্ধ রাখলে কি ক্ষতি হোত বুঝি না।

ক্ষতি নয় মা, তবে এখানকার চেয়ে ওখানে থাকতে আমার কেন যেন বেশ ভাল লাগে। তুমি ভেবো না মা। কাজ আমি বিশেষ কিছু করব না এখন। আর আমি ত আসছি দু'বেলা, দেখতে ত পাবেই ছেলেকে। দেবব্রত হাসল।

— জানি না যা খুশি কর গিয়ে। মৃন্ময়ীদেবী উত্তর দিলেন।

রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদ কিন্তু বিশেষ মানা করলেন না দেখে দেবব্রত খাওয়া-দাওয়া সেরে সেদিন দুপুরের দিকে তার বাগানবাড়ীতেই ফিরে গেল।

শ্রীধর নেই। সে আরও একটা মাস ছুটি নিয়ে গেছে। তার স্ত্রীর অসুখ নাকি খুব বাড়াবাড়ির দিকে। বিহারীও ফেরেনি। ঘর-দোরের অবস্থা আবার সেই পুনর্মুষিকভব হয়ে আছে। না ঝাড়া, না মোছা, চারিদিকে বিশৃঙ্খলতার নমুনা। দেবব্রত একবার চোখ মেলে তাকাল সেদিকে। যাক ওবেলা গিয়ে রামাকে ডেকে আনলেই হবে। দেবব্রত ঘরের সব জানালাগুলো একে একে খুলে দিল। তারপর

পূর্বদিকের ব্যালকনিতে এসে নদীর দিকে তাকিয়ে আনমনে দাঁড়িয়ে রইল।

লালিদের বাড়ী থেকে বাগানবাড়ীর এই ব্যালকনিটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সে এঘর ওঘর করে কাজ করতে করতে হঠাৎ দেবব্রতকে এই রকম মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেল। লালি চমকে উঠল। কি হয়েছে তার ছোটবাবুর।

লক্ষ্মী এসে ডাকল লালিকে। এই লালি, কি দেখছিস্ রে অমন করে। লক্ষ্মী লালির দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখল বাগানবাড়ীর ওদিককার ছাদে দাঁড়িয়ে দেবব্রত। মাথায় তার ব্যান্ডেজ বাঁধা।

লালি জিজ্ঞাসা করল — ছোটবাবুর কি হয়েছে মা?

— তা ত জানি না। কখন এল ছোট বাবু?

— আমি ত এই দেখছি।

— হয়ত কোথায় পড়ে টড়ে গেছে। লক্ষ্মী অনুমান করে বলল। — ওরে লালি তবে একটা কাজ কর না মা। যা-না বাবুরবাড়ী একবারটি। বাবুর জামা-কাপড়গুলোও দিয়ে আয়, আর অমনি খবরটাও নিয়ে আয়। বলি তাই তিন চার দিন বাবুর ঘর-দোর সব বন্ধ দেখছিলাম।

লালি কোন উত্তর করল না।

লক্ষ্মী এসে দেবব্রতের কাচা জামা-কাপড়ের বান্ডিলটা লালির হাতে ধরিয়ে দিল।

লালি তন্দ্রাবিষ্টের মত হয়ে মায়ের হাত থেকে দেবব্রতের জামা কাপড়গুলো নিয়ে চলে গেল।

দেবব্রত এতক্ষণ ধরে আনমনে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এসে একটা ইজি চেয়ারে বসল। সামনে ড্রইং বোর্ডটা রয়েছে। তাতে একটা সাদা কাগজও আঁটা আছে। দেবব্রত কাগজটার দিকে তাকিয়ে কত কিছু রূপক ছবির কল্পনা করতে লাগল।

লালি এসে দেখল আজও কেউ নেই বাড়ীতে। বাগানের মাঠটা পেরিয়ে সে এসে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে একবার থম্‌কে দাঁড়াল। একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু কাউকেই নজরে না পেয়ে সোজা উপরে উঠে এসে দেবব্রতের ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়াল।

দেবব্রত তেমনি তন্ময় হয়েই বসেছিল কাগজটার দিকে তাকিয়ে। সে

লালির আগমন অনুভব করতে পারল না।

লালি ডাকল - ছোটবাবু?

— কে?

— আমি লতা।

— ওঃ তুমি, এস লতা। দেবব্রত একটু সোজা হয়ে বসল। লালি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে কাপড়ের বাণ্ডিলটা ওদিককার আলমারীর মাথায় রেখে বলল — কি হয়েছে বাবু আপনার মাথায়?

— ও কিছু না লতা। একটু লেগেছে।

লালি দাঁড়িয়ে রইল। সে শুনতে চায় আরও কিছু। বলল — কোথাও পড়ে গিয়েছিলেন নাকি বাবু?

দেবব্রত একবার লালির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে দেখল কিছু শোনার পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে সে অপেক্ষা করছে। দেবব্রত বলল — বেশী কিছু নয়, একটা সাঁওতাল হঠাৎ মাথায় লাঠির চোট মেরেছে।

লালি চমকে উঠল। — লাঠি মেরেছে!

— হ্যাঁ, তবে বেশী লাগেনি। যাই হোক বেঁচে গেছি এ যাত্রা। আমাদের লেঠেল পাইকটা না থাকলে হয়ত আর বাঁচতাম না। ফেটেই যেত মাথাটা।

— কেমন করে এমন হল বাবু?

দেবব্রত সব খুলে বলল।

লালি শুনে বিস্ময়াহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দেবব্রত বলল — তুমি দাঁড়িয়ে কেন লতা। বসোনা। কেন আপত্তি আছে? আমার বাড়ীতে অবশ্য আজ কেউ নেই। শ্রীধর আর বিহারী দু'জনেই ছুটি নিয়েছে একমাস করে। শ্রীধরের স্ত্রীর অসুখ খুব বাড়াবাড়ি।

লালি একথা শুনে কি ভেবে একবার ঘরের চারপাশটা লক্ষ্য করল। সে দেখল ঘরের অপরিচ্ছন্ন অবস্থাটা। মেঝেয় একপুরু করে ধুলোর স্তর জমেছে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করল — তোমার কত দাম হয়েছে লতা আজ?

লালি বলল — তা ত জানি না বাবু। মা ত আমাকে আজ বলে দেয় নি। যাক্ আপনি পরে দেবেন।

লালি হঠাৎ ঘরের ওপাশে দেওয়াল ধার থেকে ঝাড়ন ঝাঁটাটা এনে

কোমর বেঁধে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল।

দেবব্রত বলল — একি লতা! তুমি এ কি করছ?

— কিছু না বাবু। একটু পরিষ্কার করে দিয়ে যাই ঘরটা, বড় ধুলো-ময়লা হয়েছে।

— সে কি! তুমি করবে এসব? আমি বিকেলে গিয়ে রামা চাকরটাকে ডেকে নিয়ে আসতাম। না-না ওটা তুমি রেখে দাও।

লালি কথা শুনল না। মৃদু হেসে বলল — বাবু আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আমার এখনি হয়ে যাবে। এতে আমার মোটেই কষ্ট হবে না।

দেবব্রত উঠে দাঁড়াল। আবার একবার বারণ করে বলল — না-না লতা এ তোমার অন্যায় হচ্ছে। ছিঃ, তুমি বাড়ী যাও।

লালি বলল দেববাবু আমি সেদিনকার কথা মত আপনার বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিলাম আজ থেকে। তাহলে ত আর কোন আপত্তি থাকবে না।

দেবব্রত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লালির মুখের দিকে।

লালি হেসে কাজ শুরু করল। ঘর ঝাঁট দিল, বিছানা পরিষ্কার করল। দেওয়ালে টাঙান ছবিগুলো হাত বাড়িয়ে বেশ করে ঝাড়ন দিয়ে চেপে পরিষ্কার করল। বাগান থেকে এক রাশ সিজন ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজাল। তারপর সদ্য আনা কাপড়-জামাগুলো ওদিককার শেলফ্-এর মাথায় তুলে রাখল।

দেবব্রত ঘরে এসে বলল বাঃ চমৎকার হয়েছে ত। সত্যি লতা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

— কি বুঝতে পারছেন না?

— কেন তুমি অকারণে আমার এত সেবা করতে আসছ!

— এমনি।

— এমনি কি কেউ কারও কিছু করে লতা?

— করে। কেন আমি ত আপনার বন্ধুত্ব মেনে নিলাম। এবার থেকে ত আর করতে আপত্তি নেই।

দেবব্রত মৃদু হাসল।

লালি বলল — আপনি দাঁড়িয়ে না থেকে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ুন দেখি।

— এত আত্মীয়তা কি করে শিখলে তুমি লতা। সত্যি আমি ভেবে পাচ্ছি না। সত্যিই তুমি আমার যোগ্য সাথী। তোমার এ উপকার আমি ভুলব না। দেবব্রত এসে বিছানায় বসল।

লালি বলল — দেববাবু আমি এবার চলি। দরকার পড়লে এই দিককার জানালাটা দিয়ে একটু ডাকবেন মাকে, লতার মা বলে। আমি আসব।

— না-না লতা, তোমার অত ভাবনার কিছু কারণ নেই। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি। তবে সামান্য দুর্বল বোধ করছি। আর মাথায় ব্যান্ডেজটা এঁটে গেছে রক্তে আর ওষুধে। ওটা খোলাও হয় নি তাই তোমার এত ভয় হচ্ছে।

— যেন খুলে ফেলবেন না তাড়াতাড়ি করে ওটা। থাক না আরও দু'দিন।

— বেশ ত, তাই থাকবে। দেবব্রত একবার এপাশ ওপাশ তাকিয়ে জলের কুঁজোটা খুঁজল। দেখতে পেয়ে বলল — যদি কিছু মনে না কর লতা, আমাকে তবে এক গ্লাস জল ঢেলে দাও কুঁজো থেকে।

লালি তখনি কুঁজোটা নিয়ে বাইরে চলে গেল। সে জানে কুঁজোতে যে জল আছে তা তিন চার দিন আগেকার তোলা জল।

লালি বাগানের টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে জল নিয়ে এল। কাঁচের গ্লাসে করে দেবব্রতকে জল দিল।

দেবব্রত জল খেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল — আঃ।

লালি কোমর থেকে নিজের জড়ান আঁচলটা খুলে ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে বলল — দেববাবু যাই আমি, দরকার হলে ডাকবেন।

— ডাকব। দেবব্রত ম্লান হেসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসল। লালি দ্বিতীয়বার দেবব্রতকে ভাল করে দেখে নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবব্রত বিছানায় শুয়েই রইল।

সন্ধ্যা সমাগমে শাঁখের শব্দে তার তন্দ্রার ঘোরটুকু কেটে গেল। সে উঠে ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করল। এই মাত্র সে স্বপ্নে দেখেছে উর্বশীকে। তারকাখচিত নক্ষত্রাকাশে উর্বশী কুণ্ডলীকৃত মেঘরাশির মধ্য দিয়ে উড়তে উড়তে পৃথিবীতে নেমে আসছে। মৃদু বাতাসে উর্বশীর লজ্জাভরন সূক্ষ্ম ওড়নার সবটুকু যেন দেহ থেকে খসে পড়ছে। উর্বশী স্মিত হাস্যে দ্রুত গতিতে লীলায়িত ছন্দে

নীচে নেমে আসছে। বুক থেকে খসে যাওয়া কাঁচুলী আর ওড়নার দিকে তার বিন্দু মাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। উত্তরণকালে উর্বশী দেবব্রতকে সামনে পেয়ে ইসারায় কত কি বলল। দেবব্রত তার একটা ইঙ্গিতও অনুধাবণ করতে পারল না। শুধু তার এইটুকু মনে পড়ে তার মধুর হাসি মাখা অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আর মনে পড়ে চম্পাকলিসদৃশ হাতের আঙুলগুলি। যে আঙুল দিয়ে সে তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য। উর্বশীর মুখ আর তার লতার মুখ যেন ভগবান এক ছাঁচে ফেলে তৈরী করেছেন। উর্বশীকে দেবভোগ্য করে স্বর্গেই রেখেছিলেন এতদিন দেবতারা। কিন্তু এখন তাদের সে ভোগ সুখে তৃপ্তি হওয়ায় তাকে বুঝি মর্তেই পাঠালেন। মর্তে অবতরণকালে উর্বশী দেবব্রতকেই প্রথম দেখতে পেয়ে তাই বুঝি হাতছানি দিয়ে ডেকেছে কত কিছু ইসারা করেছে। দেবব্রত আর একবার ভাল করে উর্বশীর সে মুখখানি মনে করতে চেষ্টা করল। কিন্তু সবই যেন ক্রমে তার মানস পট থেকে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কোথায় সেই উর্বশী যে তাকে সবে মাত্র হাতছানি দিয়ে ডাকল। কোথায়, কোথায় সে?

দেবব্রত বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে একবার ভাল করে তাকাতে লাগল।

নাঃ মনের ভুল। স্বপ্ন দেখছিল সে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন। বাড়ী ফিরতে হবে। আজ আর এখানে থাকা চলবে না। মা বিশেষ করে ফিরতে বলে দিয়েছেন। কিন্তু এখনও ত বিশেষ রাত হয় নি। কি যে করা যায় ভাবতে ভাবতে দেবব্রত অনেক দিন পরে তার সখের বাঁশের বাঁশিটা পেড়ে ভাল করে মুছে বাইরের ছাদে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাজাতে লাগল।

পুব আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠেছে।

স্বল্প জোৎস্নালোকিত ছাদে দাঁড়িয়ে দেবব্রত আজ করুণ সুরে রেহাগ বাজাল বহুক্ষণ ধরে। নিঃস্তব্দ নিশীথিনীর আকাশ-বাতাসে সুরের মর্মব্যথা প্রবেশ করল। দেবব্রতের বুকে বুঝি কিসের এক শূন্যতা। সেই শূন্যতাকে সে প্রকৃতির সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়। সে নিজে যেমন শূন্য তেমনি শূন্য করতে চায় প্রত্যেকের মনকে। বিরহীর মর্মস্পর্শী সুরের ঝংকার ভেসে এল লালির কানে। কি এক যাদু মন্ত্রের আকর্ষণে সে ঘর ছেড়ে বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে রইল। বহুক্ষণ, যতক্ষণ ধরে দেবব্রত না নিঃশেষে বিলিয়ে দিল নিজেকে সুরের ঝর্ণাধারার মধ্যে।

লালি আবিষ্টের মত হয়ে শুনল সেই সুর। সুরের নেশায় বিভোর হয়ে

সে হঠাৎ বুঝতে পারল সে যেন হারিয়ে গেছে। তার যেন সমস্ত অস্তিত্ব ওই সুরের ঝর্ণা ধারার মধ্যে লোপ পেয়েছে।

জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে লালি তার প্রথম বান্ধবটিকে এইভাবে বহুক্ষণ ধরে দেখল।

দেবব্রতও হয়ত দেখল তার প্রিয় বান্ধবীটিকে। হয়ত সে দেখল তার সদ্য দেখা উর্বশীকে ওই নির্জন নিশীথিনীর বনপ্রান্তরের কোলে এসে নেমে দাঁড়িয়ে থাকতে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে বুঝি সেই হাতছানি দিয়ে তার প্রিয় বন্ধুকে আহ্বাণ করেছে ইসারায়।

কোচোয়ান এসে বলল — গাড়ী তৈরী বাবু।

রাত হয়েছে, মা বাড়ী ফিরতে বললেন তাড়াতাড়ি।

দেবব্রত ভাবছিল — লতা তার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছে। সে তার বান্ধবী। তাকে সে সম্পূর্ণ নিজের গণ্ডীর মধ্যে করায়ত্ত করতে চায়। রূপময়ী ললনাকে দিয়ে সে এবার নূতন করে সৃষ্টি করবে অনির্বচনীয় শিল্পকলা। সে হবে প্রিয়া আমি হব প্রিয়। সে হবে উর্বশী আমি হব মহাদেব, সে হবে মেনকা আমি হব বিশ্বামিত্র। সে হবে লতা আমি হব তার অবলম্বনকারী দন্ড, যাতে ভর করে সে উঠবে। সে হবে প্রকৃতি আমি হব পুরুষ। সমস্ত স্বত্বা দিয়ে আমি তাকে দেখতে চাই, পেতে চাই। লতাহীন জীবন বুঝি মূর্তিহীন সাধনা। ওকে আমার চাই-ই।

কোচোয়ান আবার ডাকল ছোটবাবু।

দেবব্রতের তন্দ্রা ভঙ্গ হল। বলল — কে?

— বাড়ি যাবেন না বাবু? রাত হয়েছে।

হ্যাঁ যাব। চল। দেবব্রত উঠল। হাতের বাঁশীটাকে বিছানার একপাশে রেখে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে দেবব্রত এসে ফিটনে চেপে বসল।

— ফিটন চলতে লাগল চাঁদকে পিছনে ফেলে।

তের

— এস লতা ভেতরে এস, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

— মৃদু হাসতে হাসতে আজ একখানা চমৎকার শাড়ী পরে লালি দেবব্রতের ঘরে এসে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার লতা! আজ যে দেখি রূপের ফুল্‌কি ছড়াতে ছড়াতে আসছ।

লালি হেসে বলল — কেন? কি করলাম।

— তাই ত দেখছি। পরনে দামী শাড়ী হাতে চুড়ি, পায়ে মল, কানে দুল। কি ব্যাপার বলত লতা? হঠাৎ আজ এমন করে সেজেছ যে বড় ?

— কেন, সাজতে নেই নাকি মেয়ে মানুষকে?

— তা থাকবে না কেন। তবে তোমাকে ত দেখিনা এ বেশে। আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান তোমাকে দেখে।

— কি?

— মনে হচ্ছে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে বুঝি মেনকা কিংবা উর্বশী স্বর্গ থেকে সশরীরে মর্তে নেমে এসেছে।

— তাই নাকি? তবু ভাল। আমি ভাবছিলাম বুঝি আর কিছু মনে করেছেন আপনি।

— আবার আপনি কেন লতা। বলেছি না বন্ধুত্বের মধ্যে আপনির কোন স্থান নেই। তুমি বলে ডাকলে আমি সত্যিই খুশী হব লতা।

লালি দেবব্রতের মুখপানে একবার তাকিয়ে বলল - কিন্তু বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিয়েই ত একটা স্পর্ধার কাজ করেছি, আবার জমিদার তনয়কে তুমি বলে সম্বোধন করে শেষকালে তার চরম অমর্যাদা ঘটাব না ত? বলে সে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

দেবব্রত সরে এসে বলল — না গো বন্ধু না। এস কাছে এস।

— না, লালি দেবব্রতের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল বসব না। এখন, কাজ আছে।

— কি কাজ? ঘর পরিষ্কার করতে হবে নাকি?

— হ্যাঁ। অনেক কাজ আছে। ছাড়ো।

— না। আজ আর ওসব কাজে দরকার নেই লতা। বরং তুমি একটু বসো আমি তোমার একটা ছবি আঁকি এই বেশে।

— তুমি কি পাগল হলে নাকি দেবদা? এখন কি ওই সব হয়। ও আর একদিন হবে 'খন। বেলা পড়ে আসছে। লক্ষ্মীটি হাত ছাড়। দেখত ঘরটা কি বিশ্রী হয়ে রয়েছে।

— না লতা তুমি দশটা মিনিট একটু স্থির হয়ে বস। আমি একটা স্কেচ

করে নিই তোমার। সত্যি আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে না তোমায় কি বলব।

লালি তবু উঠতে গেল।

দেবব্রত লালির কাঁধ দুটো ধরে জোর করে ও পাশে ফুলদানিটার পাশে চেয়ারটাতে এনে তাকে বসিয়ে দিল।

দেবব্রতের পাগলামি দেখে লালিও আর জিদ করল না। চুপ করে বসে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

দেবব্রত বোর্ডে কাগজ এঁটে পেন্‌সিল হাতে করে তার কাজ শুরু করল। ওকি আবার বেঁকে বসেছ ত। না, না ঘাড়টা এপাশে কর, আর একটু, আর একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে এবার।

লালি এবার কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ চুপ করে বসে রইল। সে দেখছে দেবব্রতের হাতের পেন্‌সিলটা কি দ্রুত গতিতে চলছে আর সাদা কাগজটার ওপর কি কতকগুলো হিজিবিজি বিশ্রী লাইন পড়ছে।

দশ মিনিটের স্থানে আধঘন্টা হয়ে গেল। কারুরই সে দিকে খেয়াল নেই। না শিল্পীর না শিল্পীর উপজীব্যের।

ঘাড়টা ব্যথা করছে লালির, একভাবে এমন করে শক্ত হয়ে বসে থেকে। লালি আর থাকতে না পেরে বলল — আমি আর থাকতে পারছি না কিন্তু। ঘাড় ধরে গেছে।

দেবব্রত তাড়াতাড়ি উঠে এসে বলল — ওঃ তুমি বুঝি এখনও এইভাবেই বসে আছ। উঠে এস, উঠে এস। আমার কখন হয়ে গেছে।

— উঃ বা-ব্বাঃ। আচ্ছা লোক ত তুমি। হয়ে গেছে অথচ বলনি। আমার বুঝি কষ্ট হয় না। অনুযোগের সুরে লালি বলল।

দেবব্রত বলল — সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে লতা। যাক্‌গে ও সেরে যাবে এখনি। কিন্তু ও কি করছ, সেই কাজ শুরু করেছ ত। শুনবে না ত আমার কথা। বলছি আজ থাক। কেন ঘরটা ত বেশ পরিষ্কারই রয়েছে। ও বেলা ত পরিষ্কার করলে।

লালি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অন্যান্য দিনের মত আজও কাজ শুরু করল। বলল — শ্রীধরদা এলে ত আর করতে যাব না।

দেবব্রত বলল — কিন্তু লতা আজ যে তোমার নাচ দেখাবার কথা ছিল, মনে নেই বুঝি?

লালি কোন কথা বলল না।

দেবব্রত একটু সরে এসে বলল — কি শুনতে পাচ্ছ না বুঝি। বলছি তোমার যে আজ আমাকে নাচ-দেখাবার কথাছিল সে কথা মনে আছে। ছাড়ো, কাজ ছাড়ো।

লালি এবারেও দেবব্রতের কথা শুনেও শুনল না।

দেবব্রত হঠাৎ কি ভেবে বলল — ওহো বুঝেছি। এইবার বুঝেছি। তাই বলি কেন আজ হঠাৎ করে তুমি পায়ে মল — গায়ে গয়না, পরনে অমন শাড়ী পরে এসেছে। আমার পোড়া মনেও থাকে না ও সব। বলে দেবব্রত হাসতে থাকে।

লালি এবার দেবব্রতর হাসিকে ভেঙিয়ে বলল — হেঁ-হেঁ। তা মনে থাকবে কেন। কেবল ছবি আঁকলেই ব্যস। আমি নাচতে পারব না আজ।

— উঁহু তা ত হবে না। কথা দিয়েছ যখন, তখন নাচ্‌তেই হবে। ছাড়, ওসব কাজ ছেড়ে নাচ শুরু কর দেখি। আজ একটু ঘরে বসে লতাবাঈয়ের নাচ দেখি।

লালি বলল — হিসেবে ভুল হ'ল। এটা ঘর নয়। এটা জমিদার শ্রী অম্বিকা প্রসাদের বাগানবাড়ী। বল বাগানাবাড়ীতে বসে –

দেবব্রত এবার হেসে লুটিয়ে পড়ল। পরে বলল — ঠিক বলেছ ত লতা। সত্যিই ত জমিদার তনয় শ্রীমান্ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় আজ বাগানবাড়ীতে বসে বটে। তুমি ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ লতা।

লালি বলল — কিন্তু তুমি কি আমাকে তোমার সত্যিকার সেই বাগানবাড়ীর ঠিকা করা বাঈজী মনে করছ্ নাকি?

— ঠিকা করা না হলেও বেঠিকের ত বটে।

— যাও ঠাট্টা করো না।

— না, না লতা ঠাট্টা করছি না। সত্যি দেরী হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যে হয় হয়। কর একটা অন্ততঃ নাচ।

লতা ঝাড়নটা দিয়ে ছবিগুলোকে মোছা শেষ করে বলল — আমি নাচতে পারি। কিন্তু একটা সর্তে।

— কি সে সর্ত শুনি?

— তোমাকে বাঁশী বাজাতে হবে।

— ওঃ এই কথা। বেশ ত বাজাব। দেবব্রত ওদিককার ড্রেসিং টেবিলটার ওপর থেকে বাঁশের বাঁশীটা টেনে নিয়ে এসে একটা সোফায় বসল। তারপর বাঁশীতে সে দেবদাসী নৃত্যের একটা সুর তুলল।

লালি বলল — উঁহু। এই বেশে দেবদাসীর নাচ ভাল হবে না কিন্তু।

বাঁশী থামিয়ে দেবব্রত বলল — না-না বেশ হবে। তুমি নাচ। দেবব্রত আবার বাঁশীতে সুর তুলল।

লালি বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে নাচতে শুরু করল। আজ আর তার নাচের সঙ্গে শুধু তবলার বোল ফুটছে না, আজ শুধু বাঁশী। বাজাচ্ছে তার মনরাজ্যের রাজকুমার।

দেবদাসী যেন নিজেকে নিঃশেষ করে দেবতার চরণে উৎসর্গ করে দিতে লাগল।

এদেহ প্রাণ-মন সকলি যা কিছু আমার

দেব আজি শূন্য করে হে দেব চরণে তোমার।

পায়ে নূপুরের বদলে রূপোর পাঁয়জোর বাজছে। পরিষ্কার চক্‌চকে মেঝেতে লালি তার পূর্ণ অন্তর দিয়ে আজ নাচছে। তার মধ্যেও বুঝি দেবদাসী নিজে ভর করেছে। সেও-বুঝি তার জীবন যৌবন মন-প্রাণ কোন দেবতার পায়ে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিতে চায়। কিন্তু কে সে তার দেবতা। কে গ্রহণ করবে তার এই পূর্ণ ডালি।

বাঁশী বাজাতে বাজাতে দেবব্রত দেখল তার প্রিয় বান্ধবীকে। দেখল দেবদাসীকে। আর দেখল স্বচ্ছ সরল একটি নারী হৃদয়কে। দেবব্রত লালির নাচ দেখে মুগ্ধ হ'ল। নাচ শেষ হতে সে লালিকে বলল — ভারী খুশী হলাম তোমার নাচ দেখে লতা। যে নাচকে আমি সত্যই ভালবাসতাম না, সেই নাচ দেখে আজ তুমি আমার নতুন আগ্রহ টেনে আনলে।

— তাই নাকি? তবে আমার ইনাম দিন।

— ইনাম। তাই ত, কি দিই বলত? সত্যিই ত জমিদার অম্বিকা প্রসাদের সেই চির পুরাতন বাগানবাড়ীতে যেখানে কত বাঈজী এসে কত ইনাম নিয়ে গেছে নাচ দেখিয়ে, সেই বাগানবাড়ীতে সেই জমিদার তনয়ই আজ লতা বাঈয়ের নাচ দেখে কোন ইনাম দিতে পারবে না, সে কি হয়। আচ্ছা লতা তুমি আমার এই হীরের আংটীটুকুই নাও।

একেবারে হীরকাঙ্গুরী। কি সৌভাগ্য আমার। কিন্তু এ অভাগীর কপালে

এ জিনিস টিকবে কি জমিদার তনয়? যদি পুত্রের হাতে আংটী না দেখতে পেয়ে জমিদার গৃহিনী কিংবা জমিদার স্বয়ং প্রশ্ন করেন তখন তুমি কি উত্তর দেবে?

— সে তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না লতা। ওটা তুমি নাও। এ তোমার শুধু পুরষ্কার নয়, তার সঙ্গে আরও কিছু।

— আরও কিছু?

— হ্যাঁ আরও কিছু।

— তার মানে?

— সে এখন তুমি বুঝবে না লতা। পরে বুঝবে।

লতা আংটীটা নিজের হাতের আঙ্গুলে একবার পরে আবার খুলে ফেলে বলল — শেষ পর্যন্ত ধোপার মেয়ের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে না ত দেখ।

— না, না সে ভয় নেই। ওটা তুমি নাও। কিন্তু একটা কথা বলছিলাম লতা।

— কি?

— আগে কিন্তু কথা দিতে হবে। রাখবে বলো আগে সে কথা।

— উঁহু।

— না লক্ষ্মীটি। বল, কথা দাও।

— কি কথা?

— বল, আমার কথা রাখবে?

— কি কথা, বল আগে শুনি।

— আর একদিন নেচে দেখাতে হবে তোমাকে।

— কেন?

— আমি তোমার নাচ দেখে ছবি আঁকব। তবে এই দেবদাসী নৃত্য নয়। রাজনর্তকী বেশে।

— বেশ ত কথা দিলাম। কিন্তু তুমিও একটা কথা দাও আমাকে।

— কি কথা?

— এ গ্রাম ছেড়ে তুমি তোমার এই স্টুডিও উঠিয়ে নিয়ে কখনও কোথাও যাবে না।

— কেন বলত হঠাৎ এ প্রশ্ন?

— কেন জানি না। তবে আমার সত্যিই ভয় হয়,

— কি?

— ভয় হয় তুমি যেন এ গ্রাম ছেড়ে এই বাগানবাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে যাবে আবার।

— আমি চলে গেলে তোমার কি খুব কষ্ট হবে লতা?

লতা চুপ করে থাকে। মুখে কেমন যেন এক বিমর্ষভাব প্রকটিত হয়ে ওঠে।

দেবব্রত কি বুঝল সেই জানে। বলে-ভয় নেই লতা, তোমায় ছেড়ে আমি মরেও কোথাও যেতে পারব না। তুমি আমার শিল্প সাধনার প্রাণময়ী মূর্তি প্রেরণা।

— ছোটবাবু আছেন নাকি?

— কে? দেবব্রত প্রশ্ন করে।

— আজ্ঞে আমি দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী। ভেতরে আসতে পারি? ঘরের ভিতরে এসেই তিনি ওই কথা বলে একবার লজ্জাবনত লতার মুখের দিকে কটাক্ষপাত করল।

— আমাকে বড়বাবু পাঠালেন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

— কেন বলুন ত?

— বড়বাবু বলছিলেন আপনি ত এখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এইবার জমিদারিটার দিকে একটু সুনজর দিতে। ব্রজেন চৌধুরী দ্বিতীয়বার লতার দিকে কটাক্ষপাত করে বলল — এটি কে? যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে?

— ওঃ হ্যাঁ, চিনবেন বৈ কি। ও এই পাশের রামলালের মেয়ে লতা।

— ও হো হো মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। আমাদের রামলাল ধোপার মেয়েই বটে। ওই যে মহামায়া গার্লস হাই স্কুলে পড়ে। তা ভাল, তা ভাল। হ্যাঁ মেয়েটা নাচও শিখছে নাকি?

— হ্যাঁ তা শিখছে। বেশ ভালই নাচতে পারে।

— তাই নাকি? তা ছোটবাবুকে কি আজকাল লতাবাঈ নাচ্‌টাচ্‌ দেখাচ্ছে নাকি?

— দেবব্রত গম্ভীর গলায় ধমকে উঠল। একটু সভ্য হয়ে কথা বলবার

চেষ্টা করবেন দেওয়ানকাকা।

লতা এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবার বলল — আমি যাচ্ছি ছোটবাবু।

দেবব্রত বলল — এস।

লালি চলে গেল। তার পায়ে পাঁয়জোরের শব্দ হতে লাগল — ঝম্ ঝম্ ঝম্।

ব্রজেন চৌধুরী লালির চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থেকে ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করে হেসে বলল — মেয়েটা বেশ। তা বয়েস বোধ করি আঠার উনিশ হবে। কি বলেন ছোটবাবু?

দেবব্রত কিছু বলল না — শুধু ব্রজেন চৌধুরীর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল।

— তা এই বয়সে আপনার বাবার অমন একটা আধটা নয়, আধ ডজনের ওপর ছিল। কেউ আসত লক্ষ্ণৌ থেকে। কেউ দিল্লী, কেউ পাঞ্জাব, কেউ বা আসত বোম্বাই থেকে। ওরা এলে এই বাগানবাড়ীতেই নাচ-গানের আসর বসত।

দেবব্রত রুক্ষ্মস্বরে বলল — আপনি কি এই সব তর্জমাই শোনাতে এখানে এসেছেন দেওয়ানকাকা, না বাবার বিশেষ কোন কথা আছে?

— তর্জমা করতে বা শোনাতে আসিনি বটে তবে পুরোনো জিনিসগুলো সব কেমন মনে পড়ে গেল মেয়েটাকে দেখে, তাই গড় গড় করে বলেই ফেল্লাম। যাক্ অপরাধ নেবেন না যেন। হ্যাঁ বড়বাবু পাঠালেন এই বলতে যে ব্রজেন তুমি একবার গিয়ে দেবুকে বল, সে যেন আর ওই সব ছবি ছাবা নিয়ে রাতদিন মাথা খারাপ না করে। এবার একটু তক্তায় মন দিক্। নইলে যে সব যায়। তাছাড়া বাবুরও ত বয়েস হয়েছে। এবার নিজে একটু দেখে শুনে বুঝে পড়ে নিন। কবে সরে পড়বেন বাবু তার ঠিক কি।

একটু থেমে ব্রজেন চৌধুরী আরও বললেন — তা আপনি ভেবে চিন্তে এর একটা কিছু উত্তর আমাকে দিন, — আর নয়তো আপনি নিজে গিয়েই বাবুকে দেবেন। তবে দেখা শোনার ভারটা যত শিগ্‌গীর করে উঠতে পারেন সেইটাই ভাল- এটা আমারও মতে বলে। আমারও ত বয়েস হ'লো।

— আর কিছু বলবার আছে আপনার?

— না, তেমন আর কিছু নেই বটে, তবে একটা কথা বলতে ইচ্ছা

করছিল আমার নিজের।

— কি বলুন।

— বলছিলাম কি বাবু, ও সব ছোট জাতের মেয়েকে নিয়ে এতটা মাথায় তুলবেন না। সমাজে কথা উঠতে পারে। বিশেষ করে এটা গ্রাম পাড়াগাঁ। হ্যাঁ হোত জাত বাঈজী, ত কোন কথা ছিল না। কর্তাবাবুও কিছু বলতে পারতেন না। একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

— আর কিছু বলবেন?

— আজ্ঞে না। আচ্ছা চলি বলে ব্রজেন চৌধুরী তার কাঁধের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে হাতে লাঠিটা ঠক্ ঠক্ করে বার দুই মেঝেতে ঠুকে একবার দেওয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলোকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল।

দেবব্রত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে সোফায় ভাল করে এলিয়ে দিল।

ব্রজেন চৌধুরী চারিদিকটা ঘুরে সব ছবি গুলো ভাল করে দেখে বলল - — আচ্ছা বাবাজী আমি তা হলে আসি, তবে একটা কিছু বললে ভাল হত। আমাকে ত আবার গিয়ে বলতে হবে।

দেবব্রত বলল — বেশ ত বাবাকে বলবেন, তিনি যেদিন থেকে আমাকে এসব দেখাশোনা করতে বলবেন আমি সেই দিন থেকেই করব।

— শুনে খুশি হলাম বাবাজী। বড়বাবুও খুব খুশি হবেন নিশ্চয়ই এ কথা শুনে। এই না হ'লে উপযুক্ত সন্তান। আচ্ছা চলি বাবাজী। হ্যাঁ একটু চা-টাও ত হলো না। বিহারী, শ্রীধর কেউই-ত এখনও ফেরেনি দেখছি।

— ওরা এই আজকালের মধ্যেই এসে পড়বে বোধ হয়।

ব্রজেন চৌধুরী মৃদু হাসতে হাসতে বলল — কষ্ট করে পড়ে থাকার মধ্যে অবশ্য রোমান্স থাকে বলেই মানুষ পড়ে থাকতে পারে এরকম জায়গায়। নইলে আমার মত পেটুক হলে এতদিন এ তল্লাট ছেড়ে কবে সরে পড়তে হ'ত। তা বাবাজীর অভাব বোধ করি লতা বাঈই মিটিয়ে দিচ্ছে? ঘর-দোর ত দেখছি সব বেশ তক্ তক্ ঝর ঝর করছে।

— আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দেওয়ানকাকা। মনে রাখবেন আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আর এই কারণেই এখনও আমি আপনার সমস্ত কু-ইঙ্গিতগুলো নীরবে সহ্য করে যাচ্ছি। যাক্, এবার একটু ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলবেন আশা

করি।

— হে, হে, ভদ্রতা আর কোথা থেকে শিখব বাবাজী, চিরকালটা যে এইভাবেই কেটে গেল। মুখটাই হয়ে গেছে দুর্মুখ। ওটাকে কেটে বাদ না দেওয়া পর্যন্ত যেন ও আর ওর বদ অভ্যাসগুলো শোধরাতে পারবে না। আচ্ছা আর বিরক্ত করব না, অন্ধকারও হ'ল, যাই আবার সব এক গাদা কাজ পড়ে আছে ওদিকে। ব্রজেন চৌধুরী লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে একবার একটু কেশে বেরিয়ে গেল।

দেবব্রত সিগারেটের শেষ অংশটুকু মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। একটা আলো জ্বালা দরকার।

তাক থেকে দেশলাইটা পেড়ে নিয়ে দেবব্রত নিজে হাতে তার ড্রইং টেবিলের পাশে রক্ষিত বাতিদানের মধ্যে হাত পুরে মোমবাতিটা জ্বেলে দিল।

আশে পাশের ঘর-বাড়ীগুলো থেকে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি ভেসে এল।

চোদ্দ

রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদের ময়ূরপঙ্খী নাওখানি আজ কয়েক বছর ধরে এমনি অকেজো হয়েই ঘাটে পড়ে আছে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রায়বাহাদুর আর বিহারে যান না, তাঁর ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে। তাছাড়া ছেলে বড় হয়েছে, বাপের আর অতটা করা ঠিক শোভা পায় না।

সেদিন দেবব্রতের কি খেয়াল হ'ল দেওয়ানকে ডাকিয়ে বলে দিল আমি আজ একটু বেড়াতে যাব মনে করেছি দেওয়ানকাকা, আমাদের ময়ূরপঙ্খী নাওখানা কি ঠিক আছে?

— তা আছে বোধ হয়। কর্তাবাবুর খেয়াল খুশীর কথা ত বলা যায় না। ব্রজেন চৌধুরী হাসল।

— আপনি তাহলে একটু ব্যবস্থা করে দিন। দেবব্রত বলল।

— নিশ্চয়ই দেব। মাঝিগুলো ত কেবল বসে বসে মজা করছে আর নদীতে মাছ ধরবার জন্য জাল বুনছে দিনরাত। এতদিনে হয়ত বাতে ধরেছে ওদের। দেখি একবার বলে।

দেবব্রত তার ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জামগুলো গোছাতে লাগল।

ব্রজেন চৌধুরী চলে গেল মাঝিদের সন্ধানে।

লালি এসে দাঁড়াল। মুখে চটুল হাসি। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল দেবব্রতের কাণ্ডকারখানা।

হঠাৎ কি একটা সন্ধান করতে করতে দেবব্রত তার লতাকে দেখল। এই যে লতা! তুমি এসেছ — ভালই হ'লো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

লতা হেসে বলল — আমার সঙ্গে কথা? কি কথা?

— একটা কাজ করো।

— কি কাজ ? কিন্তু তার আগে বলত কোথায় চলেছ এই সক্কালে তল্পিতল্পা বেঁধে?

— সেই কথাই ত বলছি। যাচ্ছি ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে নদীভ্রমণ করতে, আর ছবি আঁকতে। যাবে ত চল। তোমাকে কাল বলতে ভুলে গেছি।

— উহুঁ। আমি কোথায় যাব?

— কেন? আমার সঙ্গে যাবে।

লতা বিস্ফারিত চোখ তুলে তাকাল। তার ধারণাতে কুলোয় না এ সে কি শুনছে। সে ভাবল সে কি তবে জেগে স্বপ্ন দেখছে না আর কিছু।

— কি হ'ল লতা। দেরী করো না। যাও লক্ষ্মীটি একটু তাড়াতাড়ি করো। দেওয়ানকাকা মাঝিদের তৈরী হতে বলতে গেছেন।

— কিন্তু আমি গিয়ে কি করব?

— কি আবার করবে। আমার পাশে থাকবে। আজ আমি নতুন করে তোমায় দেখে নুতন কিছু সৃষ্টি করতে চাই। জমিদারি দেখাশোনা করার যা তাগিদ আসছে মনে হয় এ সবের আর সুযোগ পাব না। তাই ঠিক করেছি ও কাজে হাত দেবার আগেই আমার কয়েকটা সখ মিটিয়ে নিতে চাই। সত্যি তুমি না গেলে আমার এ বিহার-ই ব্যর্থ হয়ে যাবে লতা। কি অত ভাবছ বলত?

— লতা মৃদু হেসে বলল — আমি যেতে পারব না। গেলে মা বকবে না?

— বকবে কেন? তাকে বলবে তুমি আমার সঙ্গে চলেছ। সন্ধ্যের আগেই আমরা ফিরব। সত্যি লতা আর মিছিমিছি দেরী করো না। বেলা বাড়ছে। চট্ করে যাও। আমি ঘাটে আছি — তুমি না এলে নাও ছাড়ব না।

লালির কি মনে হ'ল জানি না। তবে আজকের এই আনন্দকে সে আর কোন চিন্তা স্রোত দিয়ে ডুবিয়ে দিল না। সে বলল — সত্যি বলছ ত দেবদা, তবে যাই?

— নিশ্চয়ই। আর হ্যাঁ শোনো।

— কি?

— তোমার পাঁয়জোরটা সঙ্গে নিও।

— কেন? বিস্মিত হয়ে লতা দেবব্রতের দিকে ফিরে তাকাল।

— নিও না। পরে বলব।

লতা মৃদু হেসে বলল — তোমার দুষ্টুমি আমি বুঝেছি। না, না, আমি ওসব পারব না। ঐ সব মাঝি-মাল্লাদের মাঝখানে নাচ্‌তে।

— ওদের সামনে নাচবে কেন? ময়ূরপঙ্খীর মধ্যে ঘর রয়েছে না? সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন যাও দেখি একটু তাড়াতাড়ি।

লালি চলে গেল। যাবার সময় বাগান থেকে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা আর গোলাপ ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজে নিল বেশ করে।

ব্রজেন চৌধুরী এসে খবর দিল নাও তৈরী ছোটবাবু। মাঝিরাও এসেছে। কিছু নিয়ে যেতে হবে নাকি আপনার?

— হ্যাঁ এই যে সব তৈরী করেই রেখেছি। কই ওরা?

— ছোটবাবু আমরা হেথা। কি লিয়ে যাব বাবু? কয়েকজন মাঝি এগিয়ে এসে বলল।

দেবব্রত তার ছোট স্কেচিং স্টাণ্ড, বোর্ড এবং অন্যান্য খুঁটি-নাটি কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দিল মাঝিদের। ওরা সেগুলো নিয়ে ঘাটে এসে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িয়ে দিল।

দেবব্রত ঘরে চাবি বন্ধ করে এসে ময়ূরপঙ্খীতে চড়্‌ল। কিন্তু লতা কই? দেবব্রত দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেশ করে সন্ধান করতে লাগল লতাকে।

ব্রজেন চৌধুরী বলল — কি কারও-র আসবার কথা আছে নাকি?

দেবব্রত সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সেইভাবেই দেখতে লাগল।

— ওই যে আসছে আপনার লতাবাঈ। ব্রজেন চৌধুরী একমুখ হেসে বলল — ওহো তা আপনি আগে জানালেন না কেন ছোটবাবু। বাঈজী সঙ্গে

নিলেন একজন তবল্‌চি না থাকলে কি জমবে?

— তার মানে?

— না মানে আর কিছু না। তবে বলছিলাম তবলা জোড়াটা বোধকরি নাওয়ের মধ্যেই আছে। কেবল বাজাবার লোক একটা নিলে পারতেন। লতাবাঈ যখন সঙ্গেই চললেন।

দেবব্রত সে কথায় কর্ণপাত না করে লতাকে ডাকল — এস লতা, উঠে এস।

লতা নাওয়ে উঠবার জন্য হাত বাড়াল। কাঠের সরু পাটাতনটায় পা দিয়ে দেবব্রতের হাত ধরে। অতঃপর লতা এসে ময়ূরপঙ্খীতে চড়ল।

দেবব্রত বলল — মাঝি নাও ছাড়।

ব্রজেন চৌধুরী মৃদু হাসল। বলল — আপনার নৌকাবিহার মধুরতর হোক ছোটবাবু, চলি। কিন্তু বেশী রাত করবেন না যেন। কর্তামা সেই কথাই আমাকে বলে দিয়েছেন।

দেবব্রত হাত নেড়ে বলল — ঠিক আছে। আমরা সময়েই ফিরব।

একজন মাঝি এসে ময়ূরপঙ্খীতে পাল তুলে দিল।

পালের হাওয়া পেয়ে ময়ূরপঙ্খী পক্ষীরাজের মত পাখা মেলে কত অজানা গ্রামের মধ্য দিয়ে দ্রুত ভেসে চলল।

আকাশে খন্ড খন্ড মেঘের সঙ্গে সূর্যের লুকোচুরি খেলা চলছে। শ্বেত বলাকার দল পাখা মেলে সারি বেঁধে দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে। শঙ্খচিল আর গাঙ্‌ শালিকের দল শূন্যে মহানন্দে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। দেবব্রত আর লতা ময়ূরপঙ্খীর ছাদে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল।

লতা মুগ্ধ হয়ে গেছে তার এ হেন সৌভাগ্যে। সে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে দূর আকাশের দিকে। কত কি কথাই তার মনে উদয় হচ্ছে কিন্তু যেন কোন কথাই ফুটছে না আজ আর তার মুখ দিয়ে। আর কিই বা বলার আছে। এত সুখও যে অভাগীর কপালে ছিল তা কি ও-ই জানত।

দেবব্রত লতার তন্ময়তার এই সুযোগ নিয়ে নিচে নেমে এসে ড্রইং বোর্ডটা ঠিক করে নিয়ে ওকে দেখে স্কেচ করতে শুরু করল।

হঠাৎ লতার চমক ভাঙ্গল। একি!

দেবব্রত বলে উঠল — উহুঁহু, নড়ো না লক্ষ্মীটি। আর একটু চুপ করে

অমনিভাবে বসো। সত্যি তোমাকে যে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে না আজ, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আর একটু —'

লতা মৃদু হেসে অগত্যা সেইভাবেই বসে রইল।

দেবব্রত আবার স্কেচ করতে লাগল।

স্কেচ শেষ হতে দেবব্রত উপরে উঠে এসে বলল — রাগ করলে?

— না। রাগ করতে আর সুযোগ দিচ্ছ কই? কিন্তু সত্যি আমাকে নিয়ে এ তুমি কি আরম্ভ করেছ বল ত? আমার মধ্যে তুমি কি এমন দেখ যে সময় নেই অসময় নেই হঠাৎ করে পাগলের মত গিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করে দাও।

— জানি না লতা। তবে সত্যি তোমাকে দেখবার নেশা যেন আমায় পেয়ে বসেছে। তুমি আমার শিল্পের প্রাণময়ী দেবীমূর্তি। তোমার ওই কালো দু'জোড়া ভুরু আর চোখের মধ্যে যেন আমি সব সময় ডুবে যাই। ভগবান তোমাকে নিরুপমা করে পাঠিয়েছেন। তোমার যৌবনের বর্ণাঢ্য ছবি এঁকে জগতকে দেখাতে হবেনা?আর এই জন্যই ত তোমাকে আমি দেখতে পেলাম।

লতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে — কিন্তু দেবদা — আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে।

— কিসের ভয়?

— যেন তোমায় আমি হারিয়ে ফেলব। আমার কি এতটা এগোন ভাল হচ্ছে?

— কেন হবে না। ও সব কথা ছাড়। তুমি আর আমি। আমরা দু'জনে দু'জনার। তুমি প্রকৃতি আমি পুরুষ। তুমি সৃষ্টি করতে এসেছ আর আমি তোমার সৃষ্টির মহিমা জগৎকে দেখাতে এসেছি। আমরা দু'জনে দু'জনার একান্ত এবং তা বুঝি অনন্তকালের জন্য। তাই বুঝি আমরা এক মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে চিনে ফেলতে পেরেছি।

লতা বলল — আমারও ইচ্ছে যায় ছবি আঁকতে। তুমি আমায় আঁকা শেখাবে দেবদা।

— শেখাব। নিশ্চয়ই শেখাব।

— কিন্তু আমি কোথায় পাব তোমার আঁকার এত সাজ-সরঞ্জাম?

— কেন? তাও আমি দেব।

লতা হাসল। বলল - একটা কথা বলব?

— কি?

— বলতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

— কেন লজ্জা কিসের? বল আমি অভয় দিচ্ছি।

— বলছিলাম তুমি আমায় কোন দিন ভুলে যাবে না ত দেবদা। লতা দেবব্রতের একখানা হাত তুলে নিজের হাতের মধ্যে নিল।

দেবব্রত হাসল। বলল — ভুলব কেন? বরং মেয়ে মানুষরাই সহজে ভুলে যায় তাদের যৌবনের এই সব স্মৃতিকে।

লতা বলল — কখন-ও-না। ভুলে যাওয়াটা পুরুষেরই ধর্ম।

— যাক্ তর্ক বৃথা। জীবনে বেঁচে থাকলে একদিন পরিচয় পাওয়া যাবে।

— বেশ তুমি দেখ।

— আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন। কিন্তু এখন একটা কাজ কর দেখি।

— কি? নাচতে হবে নাকি?

— হ্যাঁ। তাই বলতে যাচ্ছিলাম। একটু নাচ না — সত্যি দেখি একটু।

— তুমি ভারী দুষ্টু।

— পুরুষজাতটাই দুষ্টু। কই তোমার পাঁয়জোর এনেছ?

— তুমি বাঁশী এনেছ?

— তা এনেছি।

দু'জনের চোখাচোখি হ'ল। দু'জনেই হঠাৎ হেসে ফেলল।

— এস নীচে এস। দেবব্রত ডাকল।

লতা দেবব্রতের হাত ধরে নেমে ঘরের মধ্যে এল।

দেবব্রত বাঁশীতে সুর তুলল।

লালি পাঁয়জোর পায়ে পরল।

মাঝিগুলো একটু মুচকি হাসল।

ময়ূরপঙ্খী পাখায় ভর করে তর-তর করে জল কেটে এগিয়ে চলতে লাগল।

বাঁশী আলাপ শেষ করে কাজ শুরু করল।

লতার পায়ে পাঁয়জোর বেজে উঠল — ঝনক্ ঝনক্ শব্দ করে।

কাঠের পাটাতনে ঘা দিয়ে লতা নাচল। তার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে। দেবব্রত প্রাণভরে লতার তনুশ্রী ও নৃত্যের ভঙ্গিমা লক্ষ্য করল। মাঝিরা দূর থেকে যতটুকু দেখা যায় তাই দেখে আনন্দানুভব করল।

নাচ শেষ করে লতা দেবব্রতের কাছে বসে পড়ে বলল — উঃ বাবাঃ হাঁপিয়ে গেছি। দেখি শিগ্গীর তোমার কোলটা পাত। একটু তোমার কোলে মাথাটা রেখে জিরিয়ে নিই।

দেবব্রত নিজের কোল পেতে লতার মাথাটা রাখতে দিল।

লতা দেবব্রতের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজল।

দেবব্রত লতাকে এত সন্নিকটে পেয়েও কিছু করল না। শুধু বলল — লতা তোমার এমনি সঙ্গ আর সরলতা যেন আমি চিরকাল পাই।

— কেন সন্দেহ হচ্ছে নাকি না পাবার? লতা চোখ খুলে দেবব্রতের দিকে তাকিয়ে বলল।

— না তা নয়, তবু বললাম এমনি।

লতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল বেলা কত হ'ল। খেতে হবে না কিছু?

— তাই ত। সত্যি একেবারেই মনে ছিল না লতা। তোমাকে পেলে আমি যেন সব কিছু ভুলে যাই।

— যাও ঠাট্টা ভাল লাগে না কেবল।

দেবব্রত বেরিয়ে এসে একজন মাঝিকে বলল — হ্যাঁরে কোথায় এলাম আমরা?

— মঙ্গলাডিহির কিনার এটা বাবু। একটা মাঝি চিৎকার করে জানাল।

— দেবব্রত চারিদিকটা তাকিয়ে দেখে বলল — আর যাসনি বাবা। এইখানে নাও ভেড়া। প্যারে গিয়ে কিছু খাবার-দাবার কিনে আন্। এখানে বাজার-হাট আবার কিছু আছে ত?

— আছে বাবু। দেন পয়সা দেন।

দেবব্রত মাঝির হাতে পয়সা দিল।

মাঝি ময়ূরপঙ্খী তীরে ভিড়িয়ে খাবারের সন্ধানে চলে গেল।

দেবব্রত তীরে নেমে এল, সঙ্গে লতাও নামল।

দেবব্রত বলল — এই বনের মাঝে তোমায় যদি সত্যি একলা কেউ দেখে না তবে কি বলবে জান?

— কি?

— বলবে বনদেবী সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন বনের মধ্যে।

— শুধু তাই কেন। দেখে হয়ত গলবস্ত্র হয়ে স্তব করতে বসে যাবে।

— বিচিত্র কিছু না।

লতা হাসল। ওকি! তুমি কি এখানেও আবার ছবি আঁকতে শুরু করবে নাকি? নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারি না। সত্যি তুমি একটা ছবি আঁকা পাগল।

— পাগল না হ'লে শিল্পী হওয়া যায় না লতা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন সত্যিই এ বিষয়ে পাগল হতে পারি।

— প্রার্থনা ত করছি দিনরাত। রাজ্যজুড়ে দেশ জুড়ে তোমার নাম হোক্। তুমি বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হও, খ্যাতি প্রতিপত্তি হোক। কিন্তু তোমার সাথে আমার কি হবে বলত? তুমি পাবে ঝুড়ি ভর্তি যশ, মান আরও কত কিছু কিন্তু আমার ভাগে কি জুটবে?

— কেন এ সবই। আমার যা কিছু পাওয়া ত সবই তোমার জন্য। এ কথা ত আমি স্বীকার করছি লতা। আমি নিমিত্ত মাত্র, তুমিই সব, তুমিই তোমার প্রকাশ, তুমিই আমার শিল্পের প্রতীক।

— থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। এখন দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি ছাড়ো দেখি আমাকে। আমার ঘাড় কন্ কন্ করছে।

ছবি আঁকা শেষ হ'তে না হ'তে মাঝি এসে খাবার দিয়ে গেল। দেবব্রত আর লালি তীরে বসে তার সদ্ব্যবহার করল, মাঝিদেরও এর অংশ দিল।

একটা মাঝি সঙ্গে করে জল এনেছিল। সে কুঁজোটা এনে সামনে রাখল।

জল দেখে দেবব্রত বলল — বাঁচালি তুই। আমি ভাবছিলাম বুঝি বা নদীর জলই খেতে হয়।

মাঝি হেসে বলল — তা কেন হোতি যাবে বাবু। বড়বাবুর যে এসব করে করে আমরা এত বড়টা হয়িছি।

লতা মাঝির কথা শুনে হাসল। বলল — দাও একটু জল দাও।

দেবব্রতই লালিকে কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিল।

খাওয়া শেষ করে দেবব্রত তার হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল — ওঃ বেলা ত অনেক হয়েছে দেখি। নাঃ আর না, চল এবার ফেরা যাক্।

মাঝিও সেই কথাই জানাল। ওদিকে আকাশটা আবার কালো হয়ে উঠছে। বুঝি বা হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়।

বড় মাঝি এসে নাওয়ের কাঁটা তুলে নিল।

ময়ূরপঙ্খী আবার ছুটল, এবার স্বগ্রামের দিকে।

পালে হাওয়া ধরল না। মাল্লারা দাঁড় ফেলতে লাগল। নদীতে দাঁড়ের শব্দ উঠল — ছপ্ ছপ্ ছপ্।

দেবব্রত আর লতা মূয়রপঙ্খীর ছাদে এসে বসল।

সূর্যদেব অস্তে চলেছেন। পশ্চিম দিগন্তে সিঁদুরে রঙের যেন ছড়াছড়ি। পূবদিকটা ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে।

মেঘ দেখে লতার গা ছম্ ছম্ করে উঠল। বলল — হঠাৎ যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয়?

— হোক্ না। বেশ ত হবে, ভিজতে ত আর হবে না।

— কিন্তু ফিরতে যে দেরী হয়ে যাবে। এখনি ত অন্ধকার হয়ে এল। সত্যি কত রাত হয়ে যাবে বলত? মা বকবে।

— বলে এসেছ ত?

— তা এসেছি। কিন্তু মা কি ভাবছে বলত?

— যাক্ ও সব ভাবনায় এখন কাজ নেই। ছবিও ত এখন আঁকা যাবে না দেখছি। কি করা যায় বলত? লালি হাসল। বলল — কেন একটু বাঁশী বাজাও না।

— না। তার চেয়ে তুমি একটা গান কর। সেদিন তোমাকে গান করতে শুনেছি।

লতা আবার হাসল।

দেবব্রত বাঁশী বাজাল। লতা তার সঙ্গে গাইল একটা ভাটিয়ালী গান।

চমৎকার। সত্যি লতা তুমি অসামান্যা। তুমি আমার মর্ম স্পর্শ করেছ।

আমি তোমাকে আরও নিবিড় করে পেতে চাই লতা।

লতা চমকে উঠল।

বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হল।

মাঝিরা চিৎকার করে দাঁড়ে জোর পাল্লা লাগাল।

দেবব্রত বলল — লতা।

— কি?

— চল তোমাতে আমাতে চলে যাই এই ময়ূরপঙ্খীতে করে সাগর পার হয়ে নতুন কোন অজানা দ্বীপে।

লতা হাসল।

ঘরের মধ্যে একটা বাতি জ্বলছে। ম্লান বাতির শিখাটুকুতে পরস্পর পরস্পরকে স্পষ্ট করে হয়ত দেখতেও পাচ্ছে না তবু দু'জনে দু'জনার অন্তরঙ্গতার নিবিড়তা অনুভব করতে লাগল।

দেবব্রত বলল — আমার মনে হয় লতা আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু তুমিও কি আমায় ভালবেসেছ লতা?

লতা ম্লান হাসল। বলল — দেবদা তোমায় আরও বড় - পৃথিবীর সেরা শিল্পী হ'তে হবে। আমি শুধু তোমার শিল্পের প্রতীক তাই না? তুমি আর কিছু আঁকবে না আমায় নিয়ে?

আঁকব বৈকি লতা। নিশ্চয়ই আঁকব। তোমায় নিয়ে আঁকার এই ত আমার শুরু। কিন্তু একি! নাও যেন কিসে ধাক্কা খেল।

মাঝিরা চিৎকার করে উঠল। নাও চড়ায় এসে আটকেছে। লগি ঠেলে নড়ছে না।

সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল।

অঝোরে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

দূরে কাছে তীরের কোন লক্ষণই নেই। কোন গাঁয়ে এলাম তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দেবব্রত দরজার গোড়ায় এসে বলল — কি মনে হচ্ছে মাঝি নাও সরানো যাবে না ত?

— না ছোট কর্তা। জোর আটকান লেগেছে।

লতা ভীত হয়ে বলল — তাহলে কি হবে?

— ভয় কিসের। না হয় রাতটুকু এই ময়ূরপঙ্খীতেই কাটবে লতা।

— কিন্তু যদি চোর ডাকাত আসে।

— এত গুলো মাল্লা আছে কি করতে? দেবব্রত হাসল।

দেবব্রত বলল — মাঝি তবে আর কি করবে, মিছিমিছি আর ভিজো না তোমরা। যাও গিয়ে নিজেদের কামরায় বসো। কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল। যদি নাও এমনি ভাসে তখন দেখা যাবে। না হ'লে রাতটা এখানেই কাটাতে হবে আর কি।

মাঝিরা সব এসে পাশের কামরায় বসে জটলা করতে লাগল।

বাইরে তখনও সশব্দে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

দেবব্রত ঘরের বাতিটা একটু জোর করে দিয়ে লতাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল ভয় করছে?

— লতা উত্তর দিল না।

পনের

— আরে ডাক্তার বিশ্বাস যে, এস এস। তারপর কি খবর বল শুনি। রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদ প্রতিবেশী ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাসকে দেখে বলে উঠলেন।

— খবর আর কি। নতুনত্ব কিছুই নেই, অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা করি নি। ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। তারপর আপনার খবর কি বলুন, শরীর কেমন?

— শরীরের কথা আর বলো না ডাক্তার। ওকে নিয়েই যত যন্ত্রণা। তোমার ও ওষুধে বুঝি আব আমার কিছু হবে না ডাক্তার। আমি বলি-কি ও সব আর থাক্।

— না, না রায়বাহাদুর, ওটা যেমন চলছে চলুক। ওষুধ বন্ধ করবেন না। আমার ত মনে হয় আপনি এতেই তবু একটু নড়াচড়া করতে পারছেন। কই একটু বসুন দেখি, একবার বুকটা আর ব্লাড প্রেশারটা দেখে নিই।

রায়বাহাদুর ডাক্তারের সামনে এসে বসলেন। ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাস তাঁর বুক আর ব্লাডপ্রেশার দেখা শেষ করে বললেন, অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে

একথা নিশ্চয়ই।

দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী এসে দাঁড়াল।

রায়বাহাদুর একবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন — কিছু বলবেন?

ব্রজেন চৌধুরী একবার মাথাটা চুলকিয়ে নিয়ে বলল — না থাক্, পরে বলব।

— না-না, থাক্ কেন। বলুন না কি কথা বলতে এসেছেন।

ডাক্তার বিশ্বাস চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিজের পকেটে ভরে একবার ব্রজেন চৌধুরীর দিকে তাকালেন।

ব্রজেন চৌধুরী বলল — ছোটবাবু কাল ময়ূরপঙ্খী নাও নিয়ে নদী বেড়াতে বেরিয়েছেন।

— হ্যাঁ তা কি হয়েছে?

— তিনি এখনও বাড়ী ফেরেন নি। বলছিলাম কি একটু খবর নিতে পাঠাব, না আরও কিছুক্ষণ দেরী করব। কর্তামা বড় উতলা হয়ে পড়েছেন।

— উতলা হবার আর কি আছে। ঝড় বৃষ্টিতে হয়ত ওরা কোন বিপদে পড়েছে তাই আসতে পারে নি। দিনের বেলা না আসে ত তখন —

ব্রজেন চৌধুরী তবু দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগল।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন — সঙ্গে আর কেউ গেছে না সে একলাই গেছে?

— আজ্ঞে, একাই গেছেন, তবে —

— তবে কি?

মাঝি-মাল্লারা আছে আর —। একটা ঢোঁক গিলে একবার ডাক্তার বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে ব্রজেন চৌধুরী বলে ফেলল — আর সঙ্গে গেছে ও পাড়ার রামলাল ধোপার মেয়ে।

— কে?

— আজ্ঞে রামলাল ধোপার মেয়ে লতা।

রায়বাহাদুর যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দেওয়ানের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন — রামলাল ত মারা গেছে না ও বছর?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— ওর মেয়ে কত বড় হয়েছে?

— আজ্ঞে বেশ বড় সড়ই হয়েছে। আঠার উনিশ হবে।

স্কুলে পড়ে, বোধ করি এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষাও দেবে।

— তাই নাকি?

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন — ও লালির কথা বলছেন বুঝি? হ্যাঁ-হ্যাঁ বেশ খাসা মেয়ে কিন্তু এই লালি।

— লালি কিনা জানি না, লতা বলেই ত জানি। ব্রজেন চৌধুরী জানাল।

— হ্যাঁ-হ্যাঁ ওই লতারই ডাক নাম লালি। এবার পরীক্ষা দেবে। রূপে-গুণে মেয়েটি সত্যিই খাসা। ডাক্তার বিশ্বাস আরও বললেন — মেয়েটি খাসা নাচ শিখেছে ওই স্কুল থেকে, চমৎকার নাচে কিন্তু। আমার মেয়ে কাজলের বন্ধু হয় ও। কাজল ত বলে স্কুলের দিদিমনিরা ওকে খুব ভালবাসে। আর ভালবাসবেই ত অমন মাথাওলা মেয়ে বড় কম মেলে।

অম্বিকা প্রসাদ সব শুনলেন। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গড়গড়ার নলটা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন — আমি এমনি একটা কিছু হবে তা কয়েকদিন ধরেই আঁচ করছিলাম। জানি বয়েসের দোষ এটা, তবু সাবধান হওয়া ভাল ছিল। ব্রজেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন — তা একটা নৌকো নিয়ে একটু এগিয়ে খোঁজই না হয় নিলেন দেওয়ান মশাই। বেটা জোটাল-জোটাল শেষ পর্যন্ত কিনা ধোপার মেয়ে। না-না এসব ভাল কথা নয়। আমি একশবার বলছি দেবব্রত তুমি এবার এসে তোমার জমিদারির কাজ-কর্ম একটু আধটু দেখাশোনা কর তা গ্রাহ্যের মধ্যে নেই। যত সব- অম্বিকা প্রসাদ উঠে ঘরময় পায়চারী শুরু করলেন।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন — ভয় নেই রায়বাহাদুর। লতা মাকে সন্দেহ করার কিছু নেই। ওর সঙ্গে দেবুর পরিচয় হ'ল কি করে জানি না, তা যতই হোক্ লতা সে ধরণের মেয়েই নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রায়বাহাদুর একটা অদ্ভুত ধরণের হাসি হেসে বললেন — ভয় অবশ্য রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদ করে না কাউকে, তবে ভাবছিলাম ছেলেটার শেষ পর্যন্ত অধোগতি হবে না ত। একটা বিয়েথা দেওয়ার কথা মনে করছি। বিলেত ফেরৎ ছেলে। ওদের অবশ্য একটা মতামত নেওয়া সমীচীন, কিন্তু —

মৃন্ময়ীদেবী এসে ঘরে ঢুকলেন, — সঙ্গে এসেছে তার মেয়ে সুহাস্, সুহাসিনী।

ব্রজেন চৌধুরী দেবব্রতের সন্ধানে চলে গেল।

মৃন্ময়ীদেবী এসে বললেন — সুহাস এসেছে, দেবুর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। ওর পিশ্বশুরের বড় মেয়ে কমলাকে নাকি খাসা দেখতে। ওরা মেয়ের বিয়ে দোব দোব করছে, তা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখই না।

— আমি যাব মেয়ের খোঁজ খবর নিতে? তুমি বল কি গিন্নী। ছেলের বিয়ে দেবে রায়বাহাদুর নিজে মেয়ে খুঁজে? হাসালে।

মৃন্ময়ীদেবী লজ্জিত হয়ে চুপ করলেন।

সুহাস এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করে বলল — না বাবা আপনি যাবেন কেন, ওরাই আসবার কথা বলছিল। আমার মুখ থেকে দাদার কথা ওরা সব শুনেছে ওরাও খুব খুশী হয়ে ছেলে দেখতে রাজী হয়েছে। তাছাড়া ওরাও জমিদার। বাপের ঐ একমাত্র মেয়ে, লেখাপড়াও কিছু শিখিয়েছে। তাছাড়া দাদার সঙ্গে মিলবে ভাল, কমলা ছবিও আঁকতে জানে।

ডাক্তার বিশ্বাস হেসে বললেন — তবে আর কি রায়বাহাদুর, একটু চেষ্টা চরিত্র করেই দেখুন না।

রায়বাহাদুর মৃদু হেসে তার গড়গড়ার নলটা মুখে নিয়ে বসলেন।

দেবব্রত এসে পৌঁছাল। একি! সুহাস তুই কখন এলি?

— এই খানিকক্ষণ দাদা। তারপর কেমন আছ বল। সুহাস, দাদাকে প্রণাম করল।

— কার সঙ্গে এলি? বারীন এসেছে?

— না তার কাজের খুব চাপ। তাই আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। দিন কয়েক পরে আসবে বলেছে।

অম্বিকা প্রসাদ গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন — এত দেরী যে তোমার? রাতে কি হয়ে ছিল?

— আসতে পারলাম না বাবা! নাও চড়ায় আটকে যাওয়ায় আর ফেরা সম্ভব হ'ল না রাতে।

অম্বিকা প্রসাদ আর কোন প্রশ্ন করলেন না। গম্ভীর হয়ে আবার নলটা মুখে তুলে নিলেন।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন — চলি রায়বাহাদুর, বেলা হ'ল। কয়েকটা কল আছে, সেরে যেতে হবে।

— আসুন।

— মৃন্ময়ীদেবী সুহাস ও দেবব্রতও সেই সঙ্গে ঘর ছেড়ে ওপরে চলে গেল।

ওপর এসে সুহাস দেবব্রতের হাত ধরে বলল — দাদা তোমার একটি খাসা বউয়ের সন্ধান করেছি।

— তাই নাকি? কোথায় রে?

— আমাদের ওখানে। আমার পিশ্বশুরের এক মাত্র মেয়ে কি সুন্দর ছবি আঁকে। তোমার নামে ত সে একেবারে পাগল। তার ঘরে তোমার আঁকা ক'খানা ছবিও দেখলাম। গতবারের এগজিবিশন থেকে কিনে এনেছে। ও বলে সত্যি এমন ছবি আঁকার যদি এক কনাও শিখতে পারতাম তবে জীবন ধন্য হোত্।

দেবব্রত কৌতূহলী ভঙ্গীতে সুহাসের কথা শোনে। বলে তারপর, তারপর।

— তারপর আর কি। ওর বাবা একাধারে জমিদার এবং শিল্পাচার্য। বাপের কাছ থেকেই অবশ্য কমলা ছবি আঁকা শিখেছে। বাপের ঐ একটি মাত্র মেয়ে, আদুরে, তাই এতদিন বিয়ে-থা দেয় নি। কিন্তু কত দিনই বা ধরে রাখবে। তাই ওরা আসছে তোমাকে দেখতে, বিয়ের কথা পাড়তে।

তাই নাকি! বেশ ত তারা এসে দেখে যাক্ তাতে অবশ্য আমার দুঃখ নেই। কিন্তু সুহাস তুই ত জানিস আমি বিয়ে-থা করব না। ও সব করলে আমার শিল্প সাধনা নষ্ট হবে।

— সে কি দাদা! তবে কি তুমি চিরকাল এমনি করেই ঘুরে বেড়াবে নাকি? মায়ের কথা ত রাখ নি, আমার কথাটাই রাখ।

দেবব্রত ম্লান হাসল। বলল — বাবা বললেও বোধ হয় এই কথাই শোনাতাম সুহাস। ও তুই বুঝবি না। যাক্ তারপর তোর আর সব খবর কি বল। কৃপেশকে নিয়ে এলি না কেন, তাকে ত দেখছি না?

— সে তার ঠাকুরমাকে ছেড়ে এল না। সুহাস এবার বিদ্রূপ করে বলল — তবে কি দাদা তুমি সত্যি-ই ওই ধোপার মেয়েকে নিয়ে ভাসবে নাকি? এসে ত অনেক কিছুই শুনলাম।

কি, কি শুনলি? দেবব্রত সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

— কি আর শুনব। শুনলাম তুমি ধোপার মেয়েকে নিয়ে খুব মেতেছ। সে না কি তোমার বাগানবাড়ীতে এসে বিছানাপত্র সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

তোমার সঙ্গে এক নৌকায় বেড়াতে যায়। তোমার ছবি আঁকার মডেল হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এসব কি দাদা?

দেবব্রত মুখ তুলে বলল — হ্যাঁ ঠিকই শুনেছিস। কে এসব কথা বলল তোদের, ব্রজেনকাকা নিশ্চয়ই।

মৃন্ময়ীদেবী এসে বললেন — হ্যাঁ, দেওয়ানবাবুই এসব কথা আমায় বলেছেন। কেন এসব কি সত্যি নয় খোকা? আর সত্যিই যদি এসব হয় তবে তোমার এতটা বাড়াবাড়ি কি ভাল হচ্ছে খোকা। এতে যে তোমার বাবার আভিজাত্যে ঘা পড়ছে। ছিঃ তোমার বয়েস হয়েছে — তোমাকে বলবার কিছু নেই। তবু যা ভাল সেই দিকেই নজর দিয়ে চলবে। ও সব মেলা-মেশা কম কর। আর সুহাস যা বলছে তা খারাপটা কিসের শুনি। কমলাকে দেখতেও খারাপ না, এইত ছবি পাঠিয়েছে, তাছাড়া সে-ও ত তোমার মনের মতই। ছবি আঁকতে টাঁকতে পারে — বেশ ত হবে। ও সব খামখেয়ালীপনা ছেড়ে দাও — তুমি কথা দিলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করি ওনাকে বলে।

দেবব্রত মুখ তুলে বলল — মা, ব্রজেনকাকা যেভাবে তোমাদের বলেছে তাতে কতটা সত্যি আছে তা খানিকটা বিচার করে দেখা উচিত ছিল। আমি ত তোমাদেরই ছেলে হঠাৎ এমন একটা কিছু করে বসব এ তুমি কি করে ভাবছ জানি না। যাই হোক এইটুকু বলি লতাকে আমি স্নেহ করি। তার বেশী কিছু না। আর হ্যাঁ, আমাকে বিয়ের কথা বলছ কিন্তু আমি ত বলেছি মা, বিয়ে করা আমার দ্বারা সম্ভব না। সে যত সুন্দরী মেয়েই হোক্ আর যত নিপুন শিল্পীই হোক, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।

মৃন্ময়ীদেবী আর কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে দরজার পর্দাটা সরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সুহাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল — এ তুমি ভাল করছ না দাদা। একটু ভাল করে ভেবে দেখ। মা-বাবা বেশীদিন আর হয়ত বাঁচবেন না। তখন কিন্তু আপশোসের সীমা থাকবে না।

দেবব্রত ম্লান হেসে উঠে গেল।

ষোল

লক্ষ্মী লোহার তারে শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাগুলোকে একটা লগির সাহায্যে পাড়ছে আর মনে মনে গজ-গজ করছে। — বাপ দিয়ে গেল আস্কারা, আর মেয়ে মাথায় উঠল। তার ওপর ওর ডাক্তারকাকা আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা

খেলো। দে তোর মেয়েকে ইস্কুলে ভর্তি করে দে, দে তোর মেয়েকে নাচের ক্লাসে ভর্তি করে, আমি সব করে কম্মে দোব। কোন পয়সা লাগবে না। এখন কি হয়। মেয়ে মাথায় উঠে নাচ্‌তে লেগেছে। জমিদারের ছেলের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি। কি করে তুই ওর সঙ্গে এক নৌকায় রাত কাটালি। মতিলাল শুনলে আর তোকে বউ করে ঘরে নেবে ভেবেছিস্।

লালি একপ্রস্থ পাট করা কাপড় নিয়ে বলল — আমি যাই এগুলো দিয়ে আসি ডাক্তারকাকার বাড়ী।

লক্ষ্মী কোন কথার উত্তর দিল না। চুপ করে কাজ করতে লাগল। এবার আসুক একবার মতিলাল, বিয়ের কথাটা পাকাপাকি করে তবে ছাড়ব। বাপ নেই বলে কি যা তা একটা হতে দেব। বলি বামন হয়ে কি তুই চাঁদে হাত দিবি নাকি? লক্ষ্মী আবার গজ গজ করতে থাকে।

— লালিমা আছিস্ নাকি? লালি। রোহিনীডাক্তার এসে দরজা ঠেলল।

লক্ষ্মী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে দরজা খুলে বলল — সে ত এইমাত্র আপনাদের বাড়ীর দিকেই গেল কাপড় নিয়ে।

— ও হো — সে ওই দিকেই গেল বুঝি। বেশ, বেশ আমিই যাচ্ছি। ওর সঙ্গে একটু দরকার আছে। মেয়েটা নাকি কাল একটা কান্ড করে ফেলেছে। বোকা মেয়ে। না-না এ সব ত ভাল কথা নয়। আচ্ছা আমিই বকে দেব। তুমি কিছু বলো না বাপু। লালি মা আমার ভয়ানক অভিমানী।

লক্ষ্মী একটু সরে এসে মাথার কাপড়টা একটু ভালকরে টেনে দিয়ে বলল — আপনি ওকে বকে দিলে কি আর ও শুনবে। ও মাথায় উঠেছে, ইস্কুলে পড়ে পেটে বিদ্যে হয়ে ও এখন যেন কেমনতর হয়ে গেছে। বলি বামন হয়ে কি চাঁদ ধরার ইচ্ছে নাকি। মুখ্যু মেয়ের কি লোভ ওই জমিদারের ছেলের ওপর জানি না। রোজ ছুঁতোনাতা করে একবার যাওয়া চাই-ই। আমি ওকে কত বার বারণ করেছি সেদিন জমিদারের ছেলের সাথে যেতে। তা শুনল না একবার। এই সোমত্ত বয়েস, কখন কি করে বসবে শেষকালে। বাবুদের মতিভ্রম হ'তে কতক্ষণ।

— তুমি ভেবো না লালির মা। তোমার মেয়ে বা জমিদারবাবুর ছেলে সে ধরণের নয়। ওরা মেলামেশা করে এই প্রথম শুনছি, তবুও এটা নিশ্চয়ই ও সব ভয়ের কিছু নেই। আচ্ছা আমি যাচ্ছি ওকে বুঝিয়ে দেব'খন।

রোহিনীডাক্তার চলে গেল।

লালি এসেছে তার সই কাজলের কাছে। কাজল বসে বসে আপন মনে

সোয়েটারের বুনন বুনছে। লালি এসে ডাকল কি করছিস লো সই।

— কে সই নাকি? আয় ভাই আয়। এই একটু বুনছি, কখন এলি? কাজল বলল।

— এই ত আসছি। তারপর আজ স্কুল যাস্‌নি কেন?

— শরীরটা ভাল নেই ভাই। জ্বর মত হয়েছে। কিন্তু তোকে এমন শুকনো শুকনো দেখছি কেন রে — সই? মনটা যেন মরা মরা। কি হয়েছে?

— কি আবার হবে। তোর যেমন কথা।

— উহুঁ, ফাঁকি দিস্ না। বুঝেছি এবার।

— কি বুঝেছিস্?

— বলব? মতিলাল এসেছে, তাই না?

— দূর পাগলী। ও আসতে যাবে কেন। আর আসলেই বা কি?

— আ-হা, আসলেই বা কি। যেন কিছুই জানেন না। তোর মা যে বলছিল এবার মতিলাল এলেই তোর সঙ্গে বিয়ে দেবে।

— আমি বিয়ে করবই না ওকে।

— তাই নাকি! তবে কাকে বিয়ে করবি শুনি।

— শুনবি?

— হুঁ, বল না।

লালি কাজলের পাশে বসে পড়ে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে কি বলল।

কাজল একমুখ হেসে বলল — ইস্, তোর যে দেখছি বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সখ্। পারবি কেন? তুই ডুবেছিস।

— ডুবেছি না মরেছি।

— সত্যি বলছিস্ না ঠাট্টা করছিস্? কাজল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

রোহিনীডাক্তার ঘরে এসে ঢুকল। — এই যে মা লালি। তুমি এখানেই রয়েছ। আমি তোমায় খুঁজতে তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম।

— কেন কাকাবাবু?

— শোন মা, এদিকে এস। কথা আছে।

লালি এগিয়ে এল।

রোহিনীডাক্তার লালিকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে গিয়ে বসাল। নিজের চাদর আর চশমাটা খুলে বলল — তুমি নাকি কাল রাতে দেবব্রতের সঙ্গে এক নাওয়ে রাত কাটিয়েছ? ছিঃ মা, এ-ত ভাল কথা নয়। তোমার বয়েস হচ্ছে, তুমি কি এখনও সেই ছোট্টটি আছো মা। আর ওরা সব বড়লোক। কখন খেয়ালের বশে কি করতে কি করে বসবে তখন মান ইজ্জত সব যাবে। তোমার বাবা মারা যাবার সময় আমার হাত দু'টি ধরে তোমায় দেখবার কথা বিশেষকরে বলে দিয়ে গেছে। অন্ততঃ তুমি তোমার বাবার সম্মানটা রাখো।

লালি কিছু বলতে গেল। কিন্তু রোহিনীবাবু বলে চললেন — জমিদারের দেওয়ানের মুখে অনেক কিছুই শুনলাম তোমার নামে। না মা, ও রকম করে একা পুরুষমানুষের কাছে যেতে নেই।

— কেন কাকাবাবু, গেলে কি হয়? দেববাবু ত আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেন না।

— তা করেন না স্বীকার করলাম্। কিন্তু তুমি এটা ভুলে যাচ্ছ কেন মা, ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। ওদের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাৎ। যাক্ তুমি যাও কাজলের সঙ্গে গল্প কর গে। ও বসে আছে। হ্যাঁ, তোমার মাকে বলে এসেছি সে তোমায় বকবে না। তবে তুমি আর ওখানে যেও না মা।

লালি আবার একটা কি বলতে গেল, কিন্তু ডাক্তারকাকা লালির সে কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

লালি এসে কাজলের কাছে বসল।

কাজল হেসে বলল — কি হল সই? মুখটা অমন গোমড়া করে ফিরছিস্ যে। কি হ'ল কি তোর?

লালি কোন কথা বলল না। তার আনত চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে দু' ফোঁটা জল মুক্তোর মত ঝরে পড়ল।

কাজল প্রশ্ন করল — বাবা তোকে কি এমন বললেন যে তুই কাঁদছিস্। বলবি না ত? কাজল তার বোনাটা পাশে রেখে লালির মুখটা তুলে ধরল।

লালি চোখ তুলে একবার কাজলের চোখে চোখ মেলাল তার পরক্ষণেই সে তার সইয়ের কোলে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পারলেও কাজল আরও কিছুক্ষণ চুপ করে

থেকে তার গায়ে মাথায় হাত বোলাল। তারপর একটু শান্ত হতে বলল — চল্ তোকে দিয়ে আসি। তুই ত আর আমায় কিছু বলবি না। আমি তোর কে বল্।

লালি আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে কাজলকে সব খুলে বলল। কাল সে দেবব্রতের সঙ্গে ময়ূরপঙ্খী নাওয়ে করে নদীতে বেড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু রাতে ফিরতে ফিরতে নদীর চড়ায় নৌকো আটকে যাওয়ায় আসতে পারা যায় নি। এই কারণে মা, ডাক্তারকাকা যা ইচ্ছে তাই বললেন। কিন্তু আমার কি অপরাধ বল্। আমি কি সত্যি ইচ্ছে করে রাত কাটাতে গিয়েছিলাম। দেববাবুকে ভালবাসি সত্যিই। তবে তার শিল্পকে আরও বেশী করে ভালবাসি। আমার ছবি আঁকবে, আমি তার মডেল হয়ে বসে থাকব এ কথা ভাবলে আমি কেমন যেন হয়ে যাই। হলামই বা আমি ছোট জাত, দেববাবু বলেন শিল্পীদের কোন জাত নেই। সব শিল্পীরাই এক জাত এক গোষ্ঠী। মানুষের হাতে গড়া জাত থেকে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

— যাক্ আর বলতে হবে না তোকে। বুঝেছি তোর মনের কথা। তুই ওকে ভালবেসেছিস্ বুঝলাম। কিন্তু এ ভালবাসার কি মূল্য তুই পাবি সে কথাটা একবার চিন্তা করে দেখেছিস্ কখনো? স্বীকার করলাম তুই নৃত্যশিল্পী ও চিত্রশিল্পী কিন্তু তোর পরিচয় যে এই মানুষের হাতে গড়া সমাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। না ভাই আমিও তোর এ কথায় সায় দিতে পারছি না। তুই ভেবে দেখ্।

রোহিনীবাবুর স্ত্রী তারাদেবী এসে দাঁড়ালেন — ওমা লালি যে। কখন এসেছিস্ মা?

— এই খানিকক্ষণ হ'ল আসছি কাকীমা। লালি বলল।

— তা ওসব কাপড় কাদের? আমাদের না কি?

— হ্যাঁ কাকীমা। লালি কাপড়গুলো মেঝে থেকে উঠিয়ে নিয়ে বলল চলুন দিয়ে আসি।

— থাক্ থাক্ আমিই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি গল্প করছ মা গল্প কর। তারপর তোমার পড়া-শোনা কেমন হচ্ছে? পরীক্ষা ত সামনে এসে গেল। আমাদের কাজল ত কিছুই পড়ছে না। বললে বলে — সব সময় পড়তে হবে নাকি। বেশ ত পড়ো না। পরীক্ষায় বসে মজা বুঝবে।

লালি ম্লান হাসল।

কাজল বলল — আবার তুমি ওই সব কথা বলছ ত মা। কই এই ত একটা মেয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা কর ত ও কতক্ষণ পড়ে বাড়িতে।

— ও ভাল মেয়ে না পড়লেও চলে। একবার চোখ বুলিয়ে নেবে যখন হোক সময় করে। কাপড়ক'টা হাতে করে তারাদেবী বললেন।

কাজল হেসে বলল — এর বেলা সুর নরম — ও ভাল মেয়ে।

তারাদেবী বললেন — তা হ্যাঁ মা লালি, এখনও ত একটু বেলা রয়েছে। অনেক দিন তোমার মুখে রামায়ণ শুনিনি। একটু পড়ে শোনাও না-মা। কাজলকে বললে ও কথা শোনে না। তাছাড়া সত্যি তোমার মত অমন মিষ্টি করে ও পড়তে পারে না।

কাজল বলল — আজ ওর মন ভাল নেই ও পারবে না মা। তোমার ওই এক স্বভাব। ও এলেই রামায়ণ শোনাও। বেচারী কোথায় একটু বেড়াতে এল, তা না।ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে রামায়ণ পড়ান।

লালি বলল — চলুন কাকীমা।

তারাদেবী বিস্মিত হয়ে বললেন — তবে না হয় আজ থাক্ না মা। কাজল যে বললে — তোমার শরীর খারাপ।

— না, না, কাকীমা ও কিছু না। আপনি চলুন। আমি পারব।

তারাদেবী এসে ঠাকুর ঘরের রোয়াকে একটা মাদুর বিছিয়ে বসলেন। রামায়ণটা পেড়ে লালিকে দিয়ে বললেন - নাও পড়।

লালি রামায়ণ পড়তে শুরু ক'রল।

সতের

লালি অনেক দিন হ'ল দেবব্রতের কাছে আসেনি।

দেবব্রত ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে। কিন্তু তবু সে আশা করে হয়ত তার লতা একদিন আসবে। হয়ত সে সুযোগের, প্রত্যাশায় আছে। সেদিন ও বলছিল বটে তার পরীক্ষা সামনে। কিন্তু পরীক্ষা ত শেষ হয়ে গেল অথচ সে আসছে না কেন? তবে কি সে তাকে মিথ্যা আশা দিয়েছে, — হবেও বা তাই। কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এমনই বা হয় কি করে। ওর বাড়ীতে মা ছাড়া ত বলবার বা বারণ করবার মত কেউ নেই। তবে কি তার নিজের বাবারই কড়া আদেশ গিয়ে পৌঁচেছে ওদের বাড়ী। যেন ওদের মেয়ে জমিদারের ছেলের সঙ্গে অহেতুক মেলামেশা না করে।

চিন্তার স্রোতে দেবব্রত ডুবে যায়।

পশ্চিম দিগন্ত রক্তিম করে সূর্য অস্ত যায়। নদীর এপারে ওপারে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘন্টা বাজতে শুরু করে। ক্রমে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসে বাগানের আশপাশ নদীর কিনারাকে ছেয়ে ফেলে।

দেবব্রত বহুক্ষণ ধরে নদীর ধারে দোতলার ছাদে এমনি আনমনে বসে চিন্তা করছিল, হঠাৎ তার কানে আজ আবার সেই নাচের সুমধুর নিক্কণ ধ্বণি ভেসে এল। হ্যাঁ, লালিদের বাড়ী থেকেই — সেই শব্দটা আসছে। দেবব্রত উঠে পশ্চিম দিকের রেলিংটা ধরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

সত্যই লালি নেচে চলেছে তার ঘরে।

ঝুমুরের শব্দ হচ্ছে রুম ঝুম ঝুমা ঝুম

মতিলাল এসেছে আজ কয়েকদিন হ'ল। সে এবার লালির জন্য নূতন বার্তা এনেছে। যদি সে তাদের নাচের দলে যোগ দিতে চায় তবে যেন অবিলম্বে চলে আসে। তবে একটা সর্ত আছে। তাকে অন্ততঃ বিশেষ কয়েকটা নৃত্যের ধরণ শিখে ফেলতে হবে এর মধ্যে। মাঝে মাত্র একটা মাস সময় আছে। এবারকার দল সারা ভারত ভ্রমণ করবে তাদের নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে, নবাগতা শিল্পী কুশলীদের নিয়ে। মতিলাল এ সুযোগকে হেলায় হারায় নি। সে তাই প্রস্তাব এনেছে লালির মা'র কাছে যদি তার মেয়েকে এই সুযোগে ছেড়ে দেয় তবে তার মেয়েরও নাম ছড়িয়ে পড়বে আর বিয়ে-থারও একটা পাকা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

লক্ষ্মী এতে মত দিয়েছে। — তুমিই যখন ওর ভাবী স্বামী, বাগদত্তা, তখন ওর ভার এক রকম তোমার ওপরই পড়ে। আমি মেয়ে-মানুষ। অত-শত বুঝি না, নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাও — যা করলে তোমার মনোমত হয় তাই করে নাও। এতে আর আমার বলার কি আছে। তবে বিয়েটা যেন শিগ্‌গীর করে হয়, এর বেশী আর বলার কিছু নেই।

মতিলাল কথা দিয়েছে — সে ভাবনা ভাবতে হবে না কাকী, দেখ্‌না তোর মেয়েকে একবার নিয়ে যাই, তারপর দেখবি, কেবল খবরের কাগজে নাম বেরুচ্ছে- আজ লতা বাঈ অমুক জায়গায় নাচছেন, অমুক জায়গায় শো দেখাচ্ছেন; ওঃ সে তুই ভাবতে পারবি না। তারপর যখন বাড়ী ফিরবে তখন দেখবি ওই বা কে আর বিলেতের রাজকন্যাই বা কে।

লক্ষ্মী মেয়ের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে হেসে বলেছিল — বেশ ত বাবা যা খুশী তাই কর। ওকে আজ থেকে তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।

সেই থেকে লালি রোজ রাত্রে মতিলালের সঙ্গে নাচ শেখে। আর বেশী

দিন হাতে নেই, মাত্র দশটা দিন আছে, এর মধ্যে সব ক'টা নাচ তার সঙ্গে শিখে ফেলতে হবে। তবেই কি না সে চান্স পাবে ওদের নাচের দলে ঢোকার। যাক্ তবু যদি একটা শিল্পী নাম ও কিনতে পারে সেই বা কম কিসের। তারপর দেশে ফিরে এসে একেবারে দেবব্রতকে গিয়ে চমক্ লাগিয়ে দেবে। তখন ত আর বাধা আপত্তির কিছু থাকবে না। সেও স্বাধীন হয়ে যাবে আর ওকেও হাত ধরে টেনে বের করে আনবে তার চলার পথে। চিত্রশিল্পী আর নৃত্যশিল্পী, জগতকে তাক্ লাগিয়ে দেবে তারা দু'জনে।

লালি ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে।

রুম্ ঝুম ঝুমা ঝুম, ঝুম ঝুম ঝুম ঝুমা।

মতিলালের এক সাকরেদ এসেছে। সে তবলা বাজাচ্ছে আর মতিলাল লালির সঙ্গে মাঝে মাঝে নাচছে। সে তাকে প্রথমটা দেখিয়ে দেয় আদব কায়দা আর নৃত্য কুশলতা। লালি ক্ষনিক দাঁড়িয়ে থেকে মতিলালকে দেখে নেয়। তারপর তার লীলায়িত সাপ্‌ল বডিদিয়ে মনোমোহিনী ভঙ্গীতে নেচে চলে।

মতিলাল একে একে তাকে অনেকগুলি নাচ শেখাল। ভারত নাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী, রাজস্থানী আরও কত কিছু।

মতিলালের চোখ দু'টো জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে লালির অপূর্ব দেহ লালিমা দেখে। এক একবার ভাবে দরকার নেই আর দলে ফিরে গিয়ে। যা শিখেছে তারা তাই দিয়ে নিজেরাই নূতন একটি দল তৈরী করতে পারবে। কিন্তু সে সামর্থ কোথা মতিলালের। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন একটা মনোমত দল তৈরী করতে। মতিলাল হতাশার একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার নাচতে শুরু করে। মুখে নাচের বোল বলে — আর সাবলীল সুঠাম দেহ পল্লব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লালিকে নৃত্য কুশলতা দেখায়।

তাক্ তাক্ ধিনা তাক্, ধিন ধিনা তাক্।।

হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে, বাঃ বাঃ বেশ হচ্ছে, — অপূর্ব — তুমি নিশ্চয়ই পারবে লতা। তুমি নিশ্চয়ই লোকমান্য পেতে সক্ষম হবে অচিরে। একথা আমি জোর গলায় এখন বলতে পারি। আরও দ্রুত নাচো। হ্যাঁ — আরও .... আরও .... আরও।

দেবব্রত রেলিং ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে লালিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে। এখনও ভেসে আসছে তবলা লহরার সাথে নূপুরের নিক্কন — তার শিল্পের দেবীমূর্তি, মর্তের মায়াবিনী অপ্সরী তার প্রিয়তমা নাচছে। যদিও সে তার

এ অপূর্ব নাচ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু তবুও সে শুনতে পাচ্ছে তার সুর। নৃত্যের ঝঙ্কার। প্রিয়তমাকে কাছে পাওয়ার চেয়ে দূর থেকে পাওয়া বুঝি আরও মধুর।

দেবব্রত প্রথমটা নাচের প্রতি বিরূপ ছিল, কিন্তু তার লতাই তার এ ভুল ধারনাটাকে ভেঙ্গে দিয়েছে অপূর্ব এক নৃত্য ভঙ্গিমা দেখিয়ে। সেদিন সে নেচেছিল দেবদাসী নৃত্য। নাচ শেষ করে লালি বলেছিল - 'নৃত্যটা হোলো দেহোৎসর্গের মতো। উর্দ্ধায়িত দেহটা হোলো একটি স্তব, একটি সকরুণ প্রার্থনা, আত্মবিসর্জনের একটি ব্যাকুল বাসনা। সেই দেহ লজ্জা জড়িত নয়, কুণ্ঠা অবগুণ্ঠা নেই সে দেহে, কারণ দানের মধ্যে সঙ্কোচ থাকলে চলবে না। সে দান গ্রহণ করেন না জীবনদেবতা। লজ্জা, মান, ভয়, দ্বিধা, লাজুকতা এরা হোলো বাধা, এরা উপাচারকে কন্টকিত করে। এদের জন্য নাচের নৈবেদ্য কলুষিত হয়।'

কিন্তু এত কথা সে শিখল কোথা থেকে। ওই ত বয়স, কি-ই বা তার বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়েছে। কিন্তু তার এ তীক্ষ্নবুদ্ধি আর নাচের ব্যাখ্যার কথার তারিফ না করে পারা যায় না।

দেবব্রত অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকে।

বিহারী এসে ডাকে — ছোটবাবু রাত হ'ল। বাড়ী যাবেন না?

বিহারীর ডাকে দেবব্রতের চমক্ ভাঙ্গে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে — ক'টা বাজল বিহারী?

— তা রাত ন'টা বাবু।

— বলিস কি বিহারী। এত রাত হয়েছে। চল যাই, দরজা-জানালাগুলো সব বন্ধ করে দে। দেবব্রত ঘরের মধ্যে ফিরে আসে।

বিহারী জানালা-দরজা বন্ধ করে বলল — আজ কি আপনি ফিরে আসবেন বাবু?

কিছুক্ষণ ভেবে দেবব্রত বলল — আসব। কিন্তু আমার এ কি হ'ল বলত বিহারী? আর যেন কিছুই ভাল লাগে না। আর যেন সে রকম আঁকতে পারি না। সে শক্তি আমার কোথায় গেল কিছু ত বুঝতে পারছি না।

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল — বাবু এবার কর্তাবাবুর কাজে না হয় ভাল করে মন দিন। থাক না, না হয় ছবি আঁকা ক'দিন বন্ধ। বাবু সেদিনেও দুঃখ করছিলেন মা'র কাছে।

তুই ঠিক বলেছিস্ বিহারী। আজ গিয়ে মাকে সেই কথাই বলব। দেখি

ক'টাদিন একটু ভাল করে জমিদারি শাসন করে। দেবব্রত উঠে গিয়ে ফিটনে চাপল।

ফিটন ছুটতে লাগল — বাড়ীর পথে।

আঠার

মাধুরী কুঞ্জের দোতলায় নীল আলো জ্বলছে।

লালি দেখতে পেয়ে সুযোগ খুঁজতে লাগল। তার ত বিদায় নেবার দিন এসে গেছে অথচ যদি না সে তার দেবদার সঙ্গে বিদায় চেয়ে আনে তবে যেন কেমন লাগে। তার জন্যই আজ সে এ পথে পা বাড়িয়েছে। লালিকে আরও বড় হতে হবে। অত বড় শিল্পীর সমতুল্য না হতে পারলে কি চলে। কিন্তু এমন হয়েছে সব যে দিনের ভাগে এক বিন্দু যদি ওদিক বাগে মুখ করতে পারা যায়। মা ত খাঁড়া তুলে আছে। তারপর ডাক্তারকাকা। আবার রাত্রে যাবারও উপায় নেই। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে মতিলাল এসে নাচের রিহার্সাল শুরু করে দেয়। অবশ্য আজ আর মতিলাল আসবে না, যাবার আগে একটা দিন লালিকে সন্তুষ্ট হয়ে সে ছুটি দিয়েছে। কিন্তু সে যায় কি করে এতটা পথ, আর যদিই বা যাওয়া যায় কতক্ষণই বা গিয়ে দাঁড়াতে পারবে সেখানে। মা যদি খোঁজ করে তবে, তার চেয়ে কিছু লিখে নিয়ে যাওয়া ভাল।

লালি চিঠি লিখতে বসল। দেবদা, আমি তোমার সাথে অনেক দিন হল দেখাসাক্ষাৎ করবার সুযোগ করে উঠতে পারি নি। তার কারণ হয়ত তুমি সবই জান। মা, ডাক্তারকাকা এরা সব বিপক্ষে। ওরা চায় আমি মতিলালকে বিয়ে করে সুখী হই। কিন্তু তুমি ত জান আমার সব সুখই তোমাকে কেন্দ্র করে। তুমি আমাকে শিল্পের প্রতীক করতে চেয়েছিলে। আমি তোমার সে প্রতীক হয়ে তোমায় সাহায্য করবার কথাও দিয়েছিলাম, কিন্তু আমায় তুমি ক্ষমা করো। আমি বুঝি আমার সে কথা রাখতে পারলাম না। আমি চলে যাচ্ছি আমার নৃত্যশিল্পের সাধনা নিয়ে। যদি কখনও লোকমান্য ও সত্যকার স্বাধীনতা নিয়ে দেশে ফিরতে পারি ত আবার এসে তোমার সাথে দেখা করব। এ ক'দিন আমায় তুমি ভুলে যেও লক্ষ্মীটি, অপরাধ নিও না। তোমার বলা শিল্পীদের জাতে নাম লেখাতেই আজ আমি এ পথে পা বাড়ালাম। সাধারণ জাতের গণ্ডী ছিঁড়ে শিল্পীর জাতে নাম লিখিয়ে যেন ফিরে এসে আবার তোমার সঙ্গে সেই আগের মত করে মিলতে পারি। ইতি - তোমার লতা।

চিঠিটা লেখা শেষ করে অতি সযত্নে লালি সেটা নিজের বুকের জামার

মধ্যে নিয়ে তার মায়ের অজ্ঞাতে গোপন অভিসারে যাত্রা করল।

আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ তখন ডোবে ডোবে। ক্ষীণ বাঁকা চাঁদের ক্ষীণতম রশ্মিটুকু তখনও রয়েছে। নদীর ধারে ঝোপ-ঝাড়গুলো থেকে ঝিঁঝির শব্দ ভেসে আসছে। ও পাশে বাঁশ আর তেঁতুল গাছের তলাটা যেন আজ গুমট অন্ধকার জমে রয়েছে। পায়ে চলা সাদা সরু পথটা ওরই তলা দিয়ে মাধুরীকুঞ্জের দিকে চলে গেছে। কতদিন ত লালি এর তলা দিয়ে দিনে-রাতে হাসতে হাসতে চলে গেছে কিন্তু আজ যেন তার গা-টা হঠাৎ ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে এর তলা দিয়ে যেতে। কি যেন একটা গোপন বস্তু ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে চলেছে। লালির মনে হ'ল এ তার মতিভ্রম। নিশ্চয়ই অহেতুক ভয় পাচ্ছে সে। এতদিনের চলা পথে এভাবে গোপনে চলাই তার কারণ। বুকে সাহস সঞ্চয় করে সে আবার চলতে শুরু করল। এবার আরও দ্রুত পায়ে।

মাধুরীকুঞ্জের বাইরের ফটকটা আজ খোলাই ছিল। লালি একবার চারিদিকটা দেখে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। বাগান পার হয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পর্যন্ত সে কোন বাধা পেল না। তবু সিঁড়িতে ওঠবার মুখে এসে একবার থমকে দাঁড়াল। সিঁড়ির মুখে নীল আলোর রশ্মি এসে পড়েছে — লালি আবার চারিদিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উপরে উঠে গেল। কিন্তু কোথায় তার অন্তরের আরাধ্য। ঘর শূন্য দেখি কেন, আর খোলাই বা কেন?

লালি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে। তবে কি সত্যই সে তার অন্তরের অন্তরতমের সঙ্গে শেষ বিদায়কালীন প্রণামটুকুও সেরে যেতে পারবে না? তবে কি সত্যই দেবব্রত এখানে আসেনি? তবে কি এ আলো অন্য কেউ জ্বেলেছে? কত প্রশ্ন উদয় হ'ল লালির মনে। তাই যদি হয় তবে এ চিঠিটাই বা সে রেখে যায় কোথায় এবং কি ভরসায়? অথচ এ তাকে রেখে যেতেই হবে। সে এই সন্দেহ করেই বুঝি চিঠি লিখে এনেছে। একদিন না একদিন তার দেবদা আসবে, হয়ত পাবে তার এই চিঠি। তখন সে হয়ত সব বুঝবে — তার না আসার কাবণ তার চলে যাওয়ার কারণ। লালি সর্বত্র সন্ধানী চোখ মেলে শেষ পর্যন্ত দেবব্রতের ছবি আঁকার তুলি রাখা কাঁচকড়ার পাত্রের তলায় চিঠিটাকে চেপে রেখে সজল চোখে বিদায় নিল।

নামবার সময়ও সে দেবব্রতকে দেখল না, পেল না কোন বাধা।

বাগান পেরিয়ে সে ফাঁকা মাঠটুকু পেরিয়ে আবার সেই বাঁশ আর তেঁতুল গাছের তলাটায় এসে থমকে দাঁড়াল, আবার যেন তার গাটা ছম্‌ ছম্‌ করে উঠল, যেন সত্যই কেউ তার পিছু নিয়েছে। লালি চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করল -

— কিন্তু তার গলা থেকে কোন স্বর বেরিয়ে এল না। কে যেন তার গলাটাও ঐ সঙ্গে চেপে ধরেছে।

লালি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে একবার চিন্তা করল এখান দিয়ে না গিয়ে যদি ওপাশের মাঠটা পেরিয়ে যায়। সে পিছু ফিরে একবার মাধুরী কুঞ্জের দোতলার নীল আলোটার দিকে তাকাল। কিন্তু কে ওই নদীর ধারের ছাদে দাঁড়িয়ে! যেন এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এদিক পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তবে কি তার দেবদা ঘর ছেড়ে ছাদে এসে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে? লালির দুঃখের সীমা রইল না, সে এতটা পথ ছুটে গেল আর ওইটুকু গিয়ে দরজা খুলে একবার ছাদটা কেন দেখল না। লালি আর ভাবতে পারে না — সে পা বাড়াল।

কে একজন এসে খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরে অস্পষ্ট অথচ গম্ভীর গলায় বলল দাঁড়াও। লালির তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়ার মত অবস্থা। তবে বুঝি সে এতক্ষণ সত্যিই কিছু অমঙ্গলের চিহ্ন দেখেছে। যে ছায়া মূর্তিকে তার এতক্ষণ ভ্রম বলে মনে হয়েছে এখন সেই ছায়ামূর্তির রূপ ধরে এসে তার হাত চেপে ধরেছে।

লালি বুকে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করল কিন্তু কি যেন একটা মিষ্টি গন্ধ এসে তার নাকে প্রবেশ করল। কেমন যেন একটা মধুর আমেজ এসে তার সারা শরীর, মন, চোখকে ধীরে ধীরে মদির করে দিল। লালি জ্ঞান হারাল।

ছায়ামূর্তি তার দুই সবল হাতে তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে নদীর বুকে নেমে গেল। ওপাশে খাঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল একখানা ছিপ নৌকার মত ছোট্ট একটা নৌকা। একজন মাত্র দাঁড় ধরে বসে আছে তাতে। ছায়ামূর্তি লালির দেহকে তুলে নিয়ে নৌকাতে ওঠা মাত্র নৌকা তীর বেগে মাঝ দরিয়ায় ভেসে গেল।

নদীর ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শে শীঘ্রই লালির জ্ঞান ফিরে এল কিন্তু সে কিছুই ঠিক করতে পারল না সে এখন কোথা। যেন থেকে থেকে ভূমিকম্পের মত সারা শরীরটা দোল খাচ্ছে। তবে কি সত্যিই ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। কিন্তু ওকি! ঘরের চালটা এত ছোট বোধ হচ্ছে কেন। একি এ যে কোনও নৌকার ছাদ। লালির সব কথা মনে পড়ল — সেই মিষ্টি গন্ধ সেই ছায়ামূর্তি, সেই সবল দুই হাতের বজ্র কঠিন চাপ। উঃ কি ভয়ানক — লালি আবার কার মুখ দেখে জ্ঞান হারাল।

দ্বিতীয়বার যখন লালির জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখল, সে উন্মুক্ত এক মাঠের মধ্যে শুয়ে আছে। সবুজ ভিজে ঘাসের স্পর্শ আর সোঁদা মাটির গন্ধ অল্প অল্প নাকে আসছে। এ গন্ধ ঠিক সেই আগের মত আমেজকারী নয়। এ তার চির পরিচিত দেশের মাটির মিষ্টিগন্ধ কিন্তু তার মাথাটা এত ভারী কেন? শরীরে এত

বেদনা বোধ হয় কেন? সে যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এ তার কি হ'ল — উঃ মাগো।

লক্ষ্মী অনেকক্ষণ ধরে খুঁজতে বেরিয়েছে মেয়েকে। কিন্তু কোথাও সে তাকে খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মাধুরীকুঞ্জে এসেছিল নিজে। সরাসরি লণ্ঠন হাতে করে দেবব্রতের ঘরে এসে তাকে প্রশ্ন করেছে — আমার লালি কোথায়? কোথায় আমার মেয়ে? বল শিগ্‌গীর বল।

দেবব্রত যেন আকাশ থেকে পড়েছে। সে কিছুই বলতে পারে না। বলে-সেকি! লালি কোথায় তা আমি কেমন করে জানব। কেন? কোথায় সে?

লক্ষ্মীর বিস্ময় লাগে। কিন্তু সন্দেহ কাটে না। সে দ্বিতীয়বার চিৎকার করে বলে — হ্যাঁ, আমিও জিজ্ঞাসা করছি আমার মেয়ে কোথায়? সে নিশ্চয়ই রাত্রে লুকিয়ে তোমার কাছে এসেছে। কোথায় সে শিগ্‌গীর বল নইলে আমি পাড়ার লোক ডাকব।

দেবব্রত বিস্মিত হয়ে এবারও বলে আমি ত জানি না তোমার লালি কোথায়। সে ত আজ প্রায় এক মাসের ওপর এদিকে আসে নি। আজও ত সে আসে নি। কেন? কি হয়েছে তার?

লক্ষ্মী কেঁদে ফেলে — ওগো আমার মেয়ে কোথায় গেল গো। সে এই খানিক আগেও যে বাড়ীতেই ছিল। আমি তাকে পড়তে দেখে ঘরে গিয়ে কাজ করছিলাম। কিন্তু কাজ সেরে ঘরে ফিরে দেখি ও নেই। কত ডাকলাম্ নাম ধরে। নদীর ধার খুঁজলাম্, ডাক্তারকাকার বাড়ী গেলাম, কই দেখলাম্ না ত ওকে। ভাবলাম্ ও তোমায় ভালবাসে, তাই বুঝি সে এই দিকপানেই এসেছে। কিন্তু হায় আমার পোড়া অদৃষ্ট — আমার অমন সোনার চাঁদ মেয়ে কোথা গেল এই রাতে। আমি এখন কি করি গো ছোটবাবু? আমায় বলে দাও।

দেবব্রত অস্থির হয়ে পড়ে।

বিহারী, শ্রীধর সব এসে হাজির হয় লক্ষ্মীর কান্না শুনে। অনেক খোঁজাখুজি সত্বেও লালিকে পাওয়া গেল না।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মী ভগ্ন হৃদয়ে যখন বাড়ী ফিরছিল তখন যেন কার অস্ফুট আর্তনাদ সে শুনতে পেল। উঃ মাগো – একটু জল।

লালি মা তুই এখানে? লক্ষ্মী চিৎকার করে ছুটে গিয়ে লালিকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

লালি মাকে কাছে পেয়ে বলল — মাগো একটু জল দে। তেষ্টায় আমার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে — বড় কষ্ট।

লক্ষ্মী তার কান্নার পালা শেষ করে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে তাড়াতাড়ি জল এনে মেয়েকে খাওয়াল। তারপর তাকে আস্তে আস্তে দাঁড় করিয়ে কাঁধে ভর করিয়ে ঘরে নিয়ে এসে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল — কি করে কি হল মা, তুই ওখানে গেলি কেমন করে?

কিন্তু লালি কোন কথার উত্তর দিতে পারল না। শুধু তার দু'চোখ বয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল বালিশের ওপর।

লক্ষ্মী আর কোন প্রশ্ন না করে বলল — ঘুমো কাল শুনব। কি কষ্ট হচ্ছে বলতে পারবি? তোর ডাক্তারকাকাকে ডাকব?

লালি শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল — না।

উনিশ

বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে সারা কলকাতা শহরটা ছেয়ে গেছে। বড় রাস্তার ধারে দেওয়াল, বাড়ী, গ্যাস লাইট পোষ্টগুলো পর্যন্ত বিজ্ঞাপনে মোড়া হয়ে আছে।

কর্মব্যস্ত শহরের কর্মব্যস্ত পথিকরা পথ চলতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দেখে থমকে দাঁড়ায়, "এলিটে বিশেষ নৃত্যাভিনয়। নবাগতা নিরুপমা লতা বাঈয়ের মনোমুগ্ধকর নৃত্যকুশলতা। আপনাদের নয়ন মুগ্ধ করার জন্য শহরে আসছেন মাত্র পনেরটি দিনের জন্য। অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন। বিলম্বে হতাশ হবেন।"

এলিটে সাতদিন আগে থেকে এই অগ্রিম টিকিট বিক্রী শুরু হয়েছে। এই সাতদিনে বার দিনের সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়ে গেছে। নূতন টিকিট ছাপা না থাকায় বার দিনের পরের টিকিট আর দেওয়া সম্ভবপর নয় — ম্যানেজার নিজে বারবার জনতার সামনে এসে জোড় হাতে এই অনুরোধই সকলকে জানিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু একদল জনতা সরে গেলেও পর মুহূর্তে আবার অনুরূপ জনতা এসে পূর্ববর্তী স্থান দখল করছে। এ যেন কোন জোয়ারের প্রবল জলস্রোত। বারে বারে এসে ধাক্কা মারছে এই টিকিট ঘরের জানালায়।

লালি সুস্থ হয়ে ওঠার পর মতিলালের সঙ্গে এসে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছে। যদিও লালির খুব অসুবিধা ও লজ্জা লাগছে তবু তার মনের অত্যুগ্র বাসনার জন্য সে সমস্ত লজ্জাকে, জড়তাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে।

আগামী কাল শো। মতিলাল এসে লালিকে বলল — আজ একটু রিহার্সাল দিয়ে না নিলে জড়তা কাটবে না। ম্যানেজার বাড়ী ভাড়া নিয়েছে বালীগঞ্জে। বড় ফ্ল্যাট। চল সেখানে গিয়ে আজ রাত্রে একটু রিহার্সাল দিইয়ে আনি।

লালি সঙ্কোচ ত্যাগ করে বলে — আমার বলার কিছু নেই। যা করনীয় তুমিই বলে কয়ে আমায় দিয়ে করিয়ে নিও। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

লালির সরলতা দেখে মতিলাল মুগ্ধ হয়। সে ভাবে বনবিহঙ্গী বুঝি তবে এবার তার সোনার খাঁচায় ধরা দিল। এ যে পোষমানাতে আর তার বেশী দিন লাগবে না। মুখে বলে – খুব ভাল কথা। এমনি সরলতাই আমি চিরকাল চেয়ে আসছি লতা তোমার কাছ থেকে। যাক্ তারপর ম্যানেজারকে তোমার কেমন লাগল বল।

— ভাল।

— হ্যাঁ, খুব ভাল লোক। ব্যবহার আচার এবং টাকা কড়ির বিষয়ে সব দিক থেকে এই ভদ্রলোক অতি অমায়িক। কোন বিষয়ে কোন কার্পণ্য নেই। তোমায় দেখে সত্যি খুব আশান্বিত হয়েছেন। গত বছর ওঁর সেরা নৃত্যশিল্পী হীরাবাঈ মারা যাবার পর থেকে উনি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন। তোমাকে দেখে আবার তার আশা হয়েছে। চল না এবার ওঠা যাক্। বেলাও ত পড়ে এল। ট্যাক্সিতে করে গড়ের মাঠের ওদিকটা একটু ঘুরে সন্ধ্যা নাগাদ ওখানে যাই।

— বেশ ত চল না, আমি তৈরী। লালি হাসল।

— কাপড়টা অন্ততঃ বদলে নাও।

— সে আর কতক্ষণ। তুমি বাইরে যাও, আমার এখনি হয়ে যাবে। লালি উঠে মতিলালের দেওয়া শাড়ীর একখানা বাক্স থেকে বার করে বলল — – কেমন এইটাই পরি?

— তোমার খুশী, বেশ ত ওইটাই পর না। চট্ করে নাও কিন্তু। আমি বাইরে আছি। মতিলাল দরজাটা টেনে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

লালি কাপড় বদলে নিয়ে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আজ ভাল করে দেখল। এত বড় আয়নার সামনে এভাবে সে নিজেকে কোন দিন দেখার সুযোগ পায় নি। সে মুখে স্নো পাউডার ঘসতে ঘসতে বারবার নিজের অপাঙ্গে ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল আর হাসতে লাগল। নাঃ সত্যিই তার রূপ আছে। তার মা সেদিন কথাটা ঠিকই বলেছে — গোবর গাদায় পদ্মফুল। কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! এত রূপই যদি ভগবান দিল তবে এত গরীব করে পাঠাল কেন?

আর তাই যদি পাঠাল তবে এ রূপকে উপলব্ধি করার চোখ দিল কেন? হঠাৎ দেবব্রতের কথা মনে পড়ে। দেবব্রতই প্রথম তার এ রূপকে আবিষ্কার করে সমাদর করে। তার মধ্য দিয়েই সে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তার এ রূপযৌবনে ভরা দেহের নৈবেদ্য তারই ভোগে লাগবে। তারই আরাধনায় সে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে। মাথার খোঁপাটা ঠিক করে নিতে নিতে লালি তার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আবার মৃদু হেসে উঠল।

মতিলাল এসে ভেতরে ঢোকে। — কই তোমার হ'ল?

— হয়েছে। কিন্তু কি দেখছো? — একটু ভদ্রতা পর্যন্ত জান না। তোমাকে বেরিয়ে যেতে বললাম অথচ —

মতিলাল দু'চোখ ভরে তখন লালির রূপ সুধাপান করছিল — সে লালির কোন কথার উত্তর দিল না।

লালি জিজ্ঞাসা করল — কি, অমন হাঁ করে কি দেখছ? নিশ্চয়ই সেই গাঁয়ের মেয়ের মতই দেখাচ্ছে তাই না?

— না লালি, — তোমাকে ঠিক স্বর্গের মায়াবিনী উর্বশীর মত মনে হচ্ছে। আমি আজ এই প্রথম তোমার এ রূপ দেখলাম। বাস্তবিক আমার আর কোন সন্দেহ নেই লালি তুমি শুধু ক'লকাতা কেন, শুধু ভারত কেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র জয়ের নিশান নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

— তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কিন্তু সত্যি আমার বড় ভয় করে, মনে হয় অত লোকের সামনে গিয়ে যদি জড়িয়ে পড়ি।

— এ সম্বন্ধে তোমায় একটা কথা বলি লালি, তুমি অর্ডিয়ান্সের দিকে মোটে লক্ষ্য করবে না। লক্ষ্য থাকবে তোমার নৃত্য কুশলতার ওপর। আর তুমি ত এই প্রথম নামছ না। দেশে থাকতে অ্যামেচারে কয়েকবার ত নেমেছ?

— তা নেচেছি। কিন্তু সে ভীড়ের সঙ্গে কলকাতার তুলনা?

— তা হোক, ও কিছু না। চল আর দেরী করে না।

মতিলাল আর লতা এসে একটা ট্যাক্সিতে উঠল। - চল রেড রোড ধরে আউট্রাম ঘাট। মতিলাল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল।

ট্যাক্সি ছুটতে লাগল রেড রোড হয়ে।

নির্ধারিত দিনে এলিট সিনেমা হলে শিক্ষিত অশিক্ষিত নৃত্যগীত রসিক জনসাধারণ আকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। তারা এসেছে শুধু নবাগতা লতা

বাঈয়ের নাচ দেখতে নয় তার দেহের রূপ-রস সৌন্দর্যকে কিছুক্ষণের জন্য দু'চোখ ভরে পান করতে। যেটা তারা তাদের নিজের নিজের অতি আত্মীয়ের কাছে পায় না সেই টুকুকেই তারা পয়সার বিনিময়ে কিনে ভোগ করতে এসেছে।

পয়সা খরচ করে একদল যায় ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের কাছে তার দেহসুধা পান করতে, আর একদল লোক আছে যারা দেহসুধার চেয়ে রূপসুধা পান করতে ভালবাসে এই ধরণের লোকেরই আজ এখানে ভীড় হয়েছে। তারা নিঃশেষে নিজের নিজের তহবিল শূন্য করে ফিরতে রাজী আছে যদি কোন মনোমোহিনী নিত্য তাদের এভাবে দেখা দিয়ে তাদের চোখের ক্ষুধা মেটাতে রাজী থাকে।

ঘড়িতে ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ভারী কাল ভেলভেটের পর্দা আস্তে উঠে দু'পাশে সরে গেল। নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহের শতশত মুগ্ধদৃষ্টি দর্শক অধীর আগ্রহে ভিতরের দিকে নিমেষ নিহত চোখ তুলে তাকাল। তারা দেখল ভারী কাল পর্দার অভ্যন্তরে রয়েছে একটি অতি সৌখীন মিহিসুতোর পর্দা। তারও অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আছে অতি মনোরম ভঙ্গীতে এক অপূর্ব নারী মূর্তি।

নৃত্যের বাজনা বেজে, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি তার লীলায়িত ছন্দে নৃত্য শুরু করল।

লতাবাঈ নাচছে রঙ্গমঞ্চে।

তার মুখে চোখে এক অপূর্ব ভঙ্গী, দেহের ছন্দ যেন আজ শত ধারে উথলে উঠছে।

একের পর এক নাচ চলতে লাগল।

কখনও লতা বাঈ একা কখনও সখি সমভি-ব্যাহারে কখনও বা কৃষ্ণরূপে মতিলালের সঙ্গে। কৃষ্ণ কদম্বমূলে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতে লাগল আর রাইকমলিনী তার গাগরী পরিত্যাগ করে যমুনা তীরে কৃষ্ণের পাশে এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণ রাইকমলিনীকে বাঁয়ে পেয়ে আনন্দে নৃত্য করল। রাইকমালিনী তার প্রিয়তমের সঙ্গে নাচল। ব্রজবালারা এসেছিল রাইকমলিনীর সঙ্গে এক সাথে জল ভরতে। তারা রাইয়ের পাশে শ্যামসুন্দরকে দেখে গাগরী কাঁকে করে নাচতে নাচতে গান শুরু করল। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাল। মৃদু বাঁশীর মিহি সুরের সঙ্গে সখী সনে রাইকমলিনী শ্যামসুন্দরকে ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নাচল গাইল — তার জীবন উৎসর্গ করল।

নাচ শেষ হ'তে নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহে হাততালির প্রবল স্রোত বইল। চিৎকার উঠল — আমরা আর একবার দেখতে চাই ওই মনোমোহিনীকে। আমরা তাকে

অতি সাধারণভাবে একবার আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে অনুরোধ করি।

ম্যানেজার একথা শুনে পর্দার বাইরে এসে দর্শকদের মিনতি করে বললেন - আপনারা চুপ করে একটু বসুন - আমি লতাবাঈকে - নিজে গিয়ে আপনাদের এ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

জনতা শান্ত হ'ল।

ম্যানেজার এসে লতা বাঈকে অনেক করে বুঝিয়ে দ্বিতীয়বার পর্দা তুলিয়ে অগনিত দর্শকদের আগ্রহান্বিত চোখের সামনে এনে দাঁড় করালেন।

লতা বাঈ হাত তুলে নমস্কার করল দর্শকদের উদ্দেশ্যে।

দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা উঠল। তারা আজ বুঝি বাস্তবিকই নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চায় ওই মনোমোহিনীর পদতলে। তারা লতা বাঈয়ের উদ্দেশ্যে ভারী ভারী নোটের তাড়া, খুচরো যা কিছু ছিল যার যার পকেটে নিঃশেষে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে লতা বাঈ জোড় হাত করে তেমনি গ্রীবাভঙ্গী সহকারে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যানেজার দর্শকদের অনুমতি নিয়ে বললেন — এবার আপনারা দয়া করে আসুন, না হলে পরের শো দেখাতে আমাদের বড় অসুবিধায় পড়তে হবে। দ্বিতীয় বার ভারী কালো পর্দার যবনিকা পড়ল।

রসোত্তীর্ণ সম্মোহিত দর্শকেরা নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে বাইরে চলে গেল।

কুড়ি

লতা বাঈকে সঙ্গে করে নাচের দল ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াল। কলকাতা থেকে তারা মাদ্রাজ গেল, মাদ্রাজ সেরে বোম্বাই, দিল্লী, পরে তারা লক্ষ্মৌতে এসে এখন উঠেছে।

সেদিন রবিবার।

লক্ষ্মৌ শহরের নবতম সিনেমাঘর লিবার্টিতে আজ নূতন করে শো আরম্ভ হচ্ছে। অগনিত দর্শকের আকুল দৃষ্টি সিনেমা পর্দার বদলে রঙ্গমঞ্চের পর্দার দিকে নিমেষ নিহত হয়ে রয়েছে। সব জায়গার মত এখানকার দর্শকরাও বুঝি ঐ একই জিনিস চায় — রূপ, রস আর পরিতৃপ্তি। যেটা তারা তাদের অতি আপনজনের

কাছে পায় না।

যথা নিয়মে পর্দা উঠল।

মধুর নৃত্য বাদ্যের সঙ্গে নাচ শুরু হল। অপলক দৃষ্টিতে দর্শকের দল দেখতে লাগল নবাগতা উদীয়মানা অসামান্যা সুন্দরী লতা বাঈয়ের অভূতপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা। দর্শকের দল পাশাপাশি আলোচনা করল সত্যি কি সাপল বডি, যেমন খুশী বাঁকাচ্ছে আর ঘোরাচ্ছে। অপূর্ব।

একের পর এক নাচ চলতে লাগল।

এখানে তারা দেখাল — মণিপুরী নৃত্য, রাজস্থানী নৃত্য আর দেখাল কথাকলি নৃত্য, কুচিপুড়ী নৃত্য।

কথাকলি নৃত্যের পার্টনার হয়ে মতিলাল নাচছে লতার সঙ্গে। দু'জনেই নাচে বিজয় পতাকা লাভ করেছে। কে কাকে হারায় আজ যেন তারই একটা রেষারেষি দ্রুত তালের সঙ্গে লতা সমান তালে পা ফেলে নেচে চলেছে। দর্শকদের মধ্যে মুহুর্মুহু হাততালি পড়ছে। উত্তেজিত হয়ে লতা আরও দ্রুত নাচতে লাগল কিন্তু একি!

— উঃ মাগো —।

লতা পা পিছলে স্টেজের মধ্যে পড়ে গেল অসাবধানে। মুহূর্তে নাচ বন্ধ হল। যবনিকা পড়ল। বাইরে দর্শক মহলে হৈ চৈ রব উঠল। কি হল? কি হল? এছাড়া আর বুঝি কারও মুখে কোন কথা নেই।

ম্যানেজার, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, মতিলাল অন্যান্য নর্তক নর্তকীরা এসে ভীড় করে দাঁড়াল। দর্শকদের মধ্যেও কয়েকজন সাহায্যকারী যুবক লাফ দিয়ে স্টেজের পর্দা সরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলেই যেন বিস্ময়ে হতবাক্। বুঝি একটা প্রশ্ন করা দরকার তাও কার-ওর মনে আসছে না। লতাবাঈ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে আর তার সারা শাড়ীটা যেন লাল রঙে কে ছুপিয়ে দিয়েছে।

পড়ে গিয়ে অসম্ভব রকম হেমারেজ হতে শুরু হয়েছে লালির। কে একজন চিৎকার করে উঠল ডাক্তার, এম্বুলেন্স।

ম্যানেজার যেন ইতিকর্তব্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে। প্রেক্ষাগৃহে যে তখনও উত্তেজিত জনতা চিৎকার হৈ চৈ করছে, তাদেরও যে একটা কিছু বলা দরকার তা তার মাথায় এল না। এ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজার সঞ্জীববাবু পর্দা সরিয়ে

স্টেজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে বলল — আপনারা দয়া করে শান্ত হোন। আপানাদের ও আমাদের চরম দুভার্গ্যবশতঃ আজ হঠাৎ লতাবাঈ ভয়ঙ্কর রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজকের শো যে এভাবে নষ্ট হবে তা আপনারা যেমন জানতে পারেন নি খানিক পূর্বে আমরাও পারিনি। এটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। দয়া করে এখন আপনারা গোলমাল না করে ফিরে যান। কিছু মনে করবেন না। যদি উনি শীঘ্র সেরে ওঠেন তবে আপনাদের আমরা আবার ওঁর নাচ দেখাবার ভরসা রাখলাম।

দর্শকের দল গুঞ্জন করতে করতে ফিরে গেল। এ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজার ভিতরে ফিরে এসে দেখল কে একজন ডাক্তার ইতি মধ্যে এসে পরীক্ষা শুরু করেছেন। বুঝি দর্শকদের মহলেই ইনি ছিলেন। তাই এত শীঘ্র তাকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে লতাকে কি একটা ইনজেকশন্ দেওয়ার পর ম্যানেজারকে বললেন — আপনার লতা বাঈয়ের নাচ বুঝি এই খানেই শেষ হল। বোধ করি ওনার অ্যাবডোমেনের একটা ভেন ছিঁড়ে গেছে। তাছাড়া পড়ে গিয়ে যে অসম্ভব রকম হেমারেজ হচ্ছে এর মূলেও অন্য কিছু একটা ব্যাপার আছে বলেই আমার সন্দেহ। আপনি যত শিগ্‌গীর পারেন এঁকে হস্‌পিট্যালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

মতিলাল গিয়েছিল হস্‌পিট্যালে খবর দিতে।

এম্বুলেন্স এসেছে। এম্বুলেন্সের বাহকদ্বয় এসে স্ট্রেচার পেড়ে অতি সাবধানে লতাবাঈয়ের দেহকে তাতে করে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

মতিলাল সঙ্গে গেল।

লতাবাঈয়ের আপন বলতে আর এখানে কেই বা আছে। তাছাড়া সে তার ভাবী স্ত্রী। উপরন্তু এখন সে নর্তকী মহলের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

ম্যানেজার আজকের মত শো বন্ধ করার আদেশ দান করে তিনিও সঙ্গে গেলেন।

হস্‌পিট্যালে এসে ডাক্তারী পরীক্ষার পর যা সংবাদ কানে এল তা ম্যানেজারের পক্ষেও যেমন মারাত্মক মতিলালের পক্ষেও তেমনি সাংঘাতিক।

লতাবাঈ অন্তঃসত্ত্বা!

অতিরিক্ত নাচের জন্য অ্যাবডোমেনের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে এভাবে

হেমারেজ হচ্ছে। রক্ত বন্ধ হওয়া শক্ত। মতিলাল মাথায় হাত দিয়ে বসল। — এ সে কি শুনল। তবে কি লতা বাঈ ভ্রষ্টা! আর সে এতকাল কাছে কাছে থেকেও তা কোনদিন ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেনি। আশ্চর্য।

ম্যানেজার শচীনমিত্র হসপিট্যালের ডাক্তারকে যথোপচিত উপদেশান্তে বললেন — আমি আর থেকে কি করব, যা হয় করুন। তবে যখন আমাদের হাতে থেকেই এতটা, খরচ-পত্র যতটা সম্ভব আমিই দেব। চিকিৎসার যেন কোন ক্রুটী না হয়।

ডাক্তার বিনয়ের সঙ্গে হেসে বললেন — সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন শচীনবাবু। আর আপনার থাকারও ত কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। আপনারা দু'জনেই বরং যেতে পারেন। দেখি একটা কোয়াগুলেন্ট ইনজেকশন্ দিয়ে কতটা কি হয় নচেৎ অ্যাবডোমেন কেটে ভেন সার্চ করে গার্ড করবার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে ব্লাডও দিতে হ'তে পারে।

— দেখুন আপনার হাত যশ। অতঃপর মতিলালের দিকে ফিরে শচীনবাবু বললেন — কি মতিলাল তুমি ফিরবে, না আরও থাকবে?

মতিলালের মাথায় তখন দুর্বার চিন্তাস্রোত এসে তাকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে তুলেছে। তার কানে শচীনবাবুর কোন কথাই পৌঁছাল না।

শচীনবাবু ম্লান হেসে চলে গেলেন।

মতিলাল তখন ভাবছিল তবে কি লতা ওই জমিদারের ছেলের কাছে গোপনে যাতায়াত·করাকালীন কিছুকরে বসল না ত? অসম্ভব কি? যার অভিভাবক বলতে কেউ নেই, সংসারেও ওই রকম অভাব অনটন সে গোপনে যে এমন একটা কিছু করেছে তাতে আর সন্দেহ কি। যাদের সম্বলের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না শুধু ভাগ্যগুণে রূপটা ছাড়া, — যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সে যে তার রূপ-যৌবন ভাঙ্গিয়েই পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেছিল, তাতে আর সন্দেহ্ কি। কিন্তু কি সাংঘাতিক এই লালির মা। কেমন বিনয়ের সঙ্গে ওর মা বার বার হাত ধরে সেধেছে বাবা মতি আর দেরী করিস্ নি। গিয়ে তোরা বিয়েটা আগে করে নিস্। ঘটা করে করতে না পারিস্ কালিঘাটে গিয়েও দু'ছড়া মালা বদল করে নিস্। আমিও নিশ্চিন্ত হই আর লালিও বাঁচে। কি জানি এই সোমত্ত বয়েস —- তার ওপর ঐ আগুনখাকি রূপ নিয়ে জন্মেছে। কখন কি হয়ে বসে বলা যায় না।

মতিলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ভাবে হ্যাঁ এই বার বিয়ে করবে তাকে একেবারে। নীচ হীনচরিত্র কোথাকার। কোথায় তাকে নিয়ে এলাম এমন

মাথায় করে লোকমান্যের উচ্চশিখরে একটু একটু করে পৌঁছে দিলাম। আর সেই তার বিনিময়ে কিনা আমায় এই পুরস্কার দিল। মতিলাল লালি কে কি করে এর উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে তারই চিন্তা করতে লাগল।

ডাক্তার পূর্নেন্দু নাগ এসে বললেন — আপনার পেসেন্টের অবস্থা এখন অনেকটা ভাল। হেমারেজ বোধ করি এমনি বন্ধ হবে, ইনজেকশন্ দিয়েছি। অপারেশনও আর করতে হবে না। আর রোগী এখন দিন কতকের মত এখানেই থাক্। এক সপ্তাহ পরে এসে নিয়ে যেতে পারবেন আশা করি। আর রাত হয়েছে, — বাড়ী ফিরবেন না?

মতিলাল তন্ময়তা ত্যাগ করে বলল — ও হ্যাঁ, রাত হয়েছে, বাড়ী যাব, হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব। আচ্ছা নমস্কার। কাল আসব।

মতিলাল চলে গেল হস্পিট্যাল থেকে।

কিন্তু কোথায় সে যাবে! হোটেলের দরজা এতক্ষণ হয়ত বন্ধ হয়েছে। তাছাড়া ওখানে ফিরতেও যেন মন চাইছে না। পা দু'টোকে টেনে টেনে মতিলাল কোনক্রমে শহরের বাইরে উন্মুক্ত মাঠে এসে বসে পড়ল।

দুরে গির্জার ঘড়িতে রাত দু'টো বাজার শব্দ হল।

মতিলাল মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল — ছিঃ ছিঃ কি মর্মান্তিক কথা। যে মেয়েমানুষকে সে সেই ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছে, যাকে তার বাবা তার বাগদত্তা হিসাবে দিয়ে গেল, সেই মেয়ে সংগোপনে এমনি একটা কেলেঙ্কারী কান্ড যে করে বসতে পারে তা কি করে ভাবা সম্ভব। এ কথা শোনার চেয়ে তার মৃত্যু হ'ল না কেন। না-না, ও আর তার কেউ নয়। লতা বাঈয়ের আজ অপমৃত্যু হয়েছে। — সে মরেছে। ভ্রষ্টানারীকে সে স্ত্রী বলে আর কখনই মেনে নিতে পারবে না। যতই হোক্ সে তার বাগদত্তা আর কিছু। কে সে? সে তার কেউ নয়। শিল্পী জীবনের কলঙ্ক সে। ঘৃণ্য, নিশ্চয়ই এ জিনিস সম্ভব হয়েছে তার ঐ ছবি আঁকা জমিদার নন্দনের সাহায্যে। আবার বলা হোত ও আমার বন্ধু, আমাকে স্নেহ করে, আমাকে মডেল করে ছবি আঁকে। তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল। ওরা পারে না এমন হীন জঘন্য কাজ নেই দুনিয়ায়। শিল্পী জাতির কলঙ্ক। ঘৃণ্য কোথাকার।

মাথার ওপর দিয়ে একটা কাল্ পেঁচা ডেকে গেল।

মতিলাল একবার মুখ তুলে আকাশের পানে তাকিয়ে থেকে অকারণে হেসে উঠল। লতাবাঈ মরেছে — তার বাগদত্তা স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু হয়েছে।

একুশ

দেবব্রত সকালে উঠে রোজকার নিয়ম মাফিক বাগানের কচি দুর্বায় ভরা সবুজ ক্ষেত মাড়িয়ে পায়চারি করছিল। বাগানের মালি ঝাঁঝরির সাহায্যে ফুলের গাছগুলোতে জল দিচ্ছিল। দেবব্রত আনমনে নীচে সবুজ ঘাসে ভরা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে ঘাসগুলোকেই আজ যেন বেশী করে দেখতে লাগল। কি সুন্দর নরম আর সবুজ এদের রঙ। বুঝি শিল্পীদের কোন রঙই এর নাগাল পায় না। প্রকৃতির কোন রূপ আর রঙ দিয়ে এরা এত সুন্দর হয়েছে কে জানে?

ক্ষেতের মাঝে মাঝে জন্মেছে দু'একটা ভিন্ন জাতের ঘাস্। তাদের মাথায় ছোট ছোট হলুদ আর বেগুনী রঙের ফুলও ফুটেছে। রাতে পড়া শিশির বিন্দুগুলো ঘাসের সরু ডগায় এখনও আটকে রয়েছে। সূর্যের প্রথম স্পর্শ এসে পড়েছে তাতে। দূর থেকে হঠাৎ করে দেখলে যেন মনে হয় অগনিত দামী মণি-মাণিক্যের কুচি বুঝি মাঠ-ময় কে ছড়িয়ে রেখে গেছে।

পায়চারি করতে করতে দেবব্রত ভাবছিল তার শিল্পের যেন অপমৃত্যু হয়েছে। তার শিল্প সাধনার উৎস্য চলে গিয়ে পর্যন্ত সে একখানাও ভাল ছবি আঁকতে পারল না আজ পাঁচ পাঁচটা মাস ধরে। দেবব্রত ভাবল ব্যর্থ এই জীবন আর ব্যর্থ তার শিল্পের সাধনা। একজন নারীর অভাবে যেখানে শিল্পের অপমৃত্যু হয় তার সে মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নিজেকেই তার আজকাল লজ্জা লাগে। এত শিক্ষা এত গৌরব, এত যশ সব যেন কোথা দিয়ে কি করে হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল।

মেয়েছেলে জাতটাই বুঝি এমনি। যখন যাকে পায় তখনি তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। যে ক'দিন লতা তার সান্নিধ্যে এসেছিল সে যেন তাকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে চাইত না। কিন্তু কে এক মতিলাল? তার আসার সঙ্গে সঙ্গে লতা যেন কেমনতর হয়ে গেল। ওর মা বলছিল বটে — মতিলাল ওর বাগদত্ত স্বামী। চমৎকার! অথচ ওই মেয়ে কি অভিনয়ই না করে গেল তার সঙ্গে। আমি তোমার — আমি তোমার শিল্পের উপলক্ষ্য প্রতীক আর তুমি আমার রূপ সৌন্দর্যের মূর্তিমান প্রকাশক। আমরা দু'জনে দু'জনকে ছাড়া বাঁচব না। দু'জনে দু'জনের সাহায্য ব্যাতিরেকে বাড়তে পারব না।

সেদিন দেবব্রত তাকে তাই বলেছিল — লতা তুমি ঠিক লতারই মত। ঠিক যেন একটা মাত্র অবলম্বন, একটা মাত্র আকর্ষীর সন্ধানে দু'হাত বাড়িয়ে

এগিয়ে আসছ। দেবব্রত তাকে আরও বলেছিল — কিন্তু লতা যদি মনে কর এই আকর্ষী সহজলভ্য না হয় বা উপযুক্ত দন্ড না হয়, তবে তোমার ঐ হাত বাড়ানো বৃথাই হবে। তুমি ধরেও ধরতে পারবে না তোমার নাগালের বাইরেই থেকে যাবে ঐ আকর্ষীদন্ড। লতা হেসে বলেছিল — নাই বা পেলাম, আঁকড়ে ধরার মত অন্য কিছু পেতে কতক্ষণ। দেখ না কোন লতা কাছে-পিঠে কোন অবলম্বনকারী দন্ড বা কিছু না পেলে ঝুলে পড়ে মুখ নত করে তবু সে হাত বাড়াতে ছাড়ে না। সে জানে কাছে পিঠে না পাই অনতিদূরে গিয়েও নিশ্চয়ই মিলবে কোন না কোন একটা কিছু। আমি কিন্তু সে রকম চাই না, আমি আমার নাগালের মধ্যে তোমাকেই চাই। আমি তোমাকেই ভর করে বেড়ে উঠব। আমার সমস্ত রূপ-যৌবন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে তোমাকে ভর করেই।

দেবব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল — কিন্তু আজ। আজ কোথায় সে। কোথায় রইল তার সেই কথা, আর কোথায় রইল তার মূল্যবান অবলম্বনকারী সেই দন্ড। সে ছুটে গেছে সহজ লভ্য এক সাধারণ দন্ডকে অবলম্বন করতে। বৃথাই আশ্বাস দিয়েছিল সে। ওরা যা চায় তাই কি পায়। আর পেলেও বুঝি তা নেয় না সহজে। ওদের ধর্মই বুঝি এই। কিন্তু একি! এটা কি লতাগাছ। অতি অদ্ভুত দেখতে ত। কেমন সুন্দরভাবে এই কাষ্ঠ দন্ডটিকে জড়িয়ে ধরে ওঠবার চেষ্টা করছে। লতাটির সামনে দু'টি শৃঙ্গ ঠিক যেন দু'টি বাহুসদৃশ। যেন দু'টি হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় উপরের ওই ঝোলান মূল্যবান কাষ্ঠদন্ডটিকে? শৃঙ্গদু'টি যেন স্পষ্ট ওই কাষ্ঠদন্ডটিকে দেখতে পাচ্ছে। অতি অদ্ভুত লাগছে দেবব্রতের। সে অভিভূতের মত হয়ে চেয়ে রইল ওই নূতন লাগানো লতা গাছটির দিকে।

শ্রীধর এসে বলল — বাবু এ লতা গাছটা আপনার ঐ ধোপাদের মেয়েটা এনে বসিয়ে দিয়ে গেছল। কি যেন এক রকম বেগুনী ফুল ধরে ওতে, থোকা থোকা হয়ে — ও বলেছিল।

দেবব্রতের মনে পড়ল। বলল — হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্ শ্রীধর, ওটা লতাই এনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বটে। বলেছিল — দেবদা এটাকে বসিয়ে গেলাম তোমার বাগানে, যত্নে বড় করো। দেবব্রতের আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল — দেখিস শ্রীধর, এটা যেন না মরে। খুব সাবধানে এটার যত্ন করিস্। গাছটার নাম দিলাম লতা। খুব সম্ভবত এই বছরেই ওর ফুল ফুটবে। আর তাও যদি না হয় আসছে বছর ত নিশ্চয়ই।

— তা ফুটবে বাবু। আমার নজর সব সময় ও গাছের ওপর থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন ছোটকর্তা। শ্রীধর একমুখ হেসে বলল।

দেবব্রত তখনও সেই গাছটার দিকে তন্ময়ভাবে চেয়ে থেকে বলল — শ্রীধর চট করে আমার ড্রইং বোর্ডটা আর একটা পেন্সিল নিয়ে আয় ত দেখি ওপর থেকে।

শ্রীধর অবাক হয়ে জলের ঝারিটা নামিয়ে রেখে ওপরে উঠে গিয়ে বিহারীর সাহায্যে ড্রইং বোর্ড কাগজ আর একটা পেন্সিল এনে দিল দেবব্রতকে।

দেবব্রত ড্রইংবোর্ডটাতে কাগজটা কোন মতে আটকে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে ঐ লতা গাছটার স্কেচ করতে শুরু করল।

— দেবদা।

— উঁ। দেবব্রত আনমনে উত্তর দিল।

— দেবদা আমি লতা। বাড়ী ফিরে এলাম। লতা এসে ঢিপ করে দেবব্রতকে একটা প্রণাম করল।

দেবব্রত অবাক বিস্ময়ে লতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল — একি! লতা তুমি।

— হ্যাঁ দেবদা আমি। চলে এলাম শহর ছেড়ে। বড় বিপদে পড়ে তোমার পরামর্শ চাইতে এসেছি।

— বিপদ। কিসের বিপদ লতা? দেবব্রত স্কেচিং বন্ধ করে লতার মুখ-পানে তাকাল।

— কিন্তু দেবদা আমি যে সে কথা বলতে পারছি না। এর চেয়ে আমার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল দেবদা। আমি তোমার কাছে এ মুখ আবার দেখালাম কি করে জানিনা। লতার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়ল। তারকণ্ঠ রুদ্ধ হল।

দেবব্রত সরে এসে লতার মাথায় হাত দিয়ে তার চিবুকটা তুলে ধরে প্রশ্ন করল — কি হয়েছে তোমার লতা? কি এমন বিপদ যে এত ভেঙ্গে পড়ছ? কাগজে তোমার এত লোকমান্যকর খ্যাতি বেরিয়েছে, সসম্মানে পরীক্ষায় পাশ করেছ তা সত্ত্বেও তোমার কি এমন বিপদ? বল আমায় খুলে বল। ছিঃ লজ্জা করো না লক্ষ্মীটি।

লতা দেবব্রতের স্পর্শ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে আজ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তার হাতে ছেড়ে দিল। সে দেবব্রতের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল।

দেবব্রত লতারই আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল —

– ছিঃ লতা কাঁদে না। বল আমায় তোমার কি হয়েছে। আমি শুনতে চাই তোমার সব কথা।

লতা তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠে বলল — ওগো আমায় তুমি ঘৃণা কর। তোমার লতার অপমৃত্যু হয়েছে। সে মরেছে।

দেবব্রত বলে — না লতা না, তুমি সাধারণ নারী নও। তুমি অসামান্যা। তোমার অপমৃত্যু হতে পারে না। তোমার অপমৃত্যু হলে আমার শিল্পের অপমৃত্যু হবে। কিন্তু লক্ষ্মীটি আর দেরী করো না, বল — সত্যি তোমার কি হয়েছে?

লতা দেবব্রতের বুকে মাথা রেখে তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দেবব্রত বলল — তুমি প্রথম থেকে আমার মর্মস্পর্শ করেছ। আমি জানি তুমি আর আমি এসেছি দু'জনে দু'জনার জন্য। তুমি যেমন করে আমার বন্ধুত্ব কামনা কর আমিও তেমনি কামনা করি তোমার সাহচর্য — তোমার প্রেরণা। তুমি চলে যাওয়াতে আমার শিল্পের উৎসমুখ স্তব্ধ হয়েছে আমার হাত নীরব হয়েছে। তুমি যে আমার শিল্পের জীবন্ত প্রতিমূর্তি –।

লতা দেবব্রতের এসব কথা শুনে তার বুক থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে পুনরায় দেবব্রতকে প্রণাম করে বলল — আমাকে তুমি তোমার শেষবারের মত চরণধূলি দাও। তুমি আমাকে এখনও এত স্নেহ কর জানতাম না।

— আহা থাক্ থাক্।

লতা বলল — আমি তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করব বলেই দেশে ফিরে আগে তোমার কাছেই এসেছি। আমি ভ্রষ্টা, নষ্ট চরিত্রা। তুমি আর আমার মুখ দেখো না। আমি আজই কোপাইয়ের শান্ত জলে ডুবে নিজের প্রায়শ্চিত্ত করব। লতা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দু'হাতে তার মুখ ঢাকল।

দেবব্রত লতার মাথায় হাত রেখে পুনরায় বলল — ছিঃ লতা কেঁদো না। তোমার এ সব কথার অর্থ কি? আমি এখনও তার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। তুমি তোমার মনের সব কথা আমাকে জানবার সুযোগ দাও, কি হয়েছে সব খুলে বল।

লতা আর কিছু গোপন করল না। সে লক্ষ্মৌয়ের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। কিন্তু এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দেবদা এ আমার কি করে হ'ল। তুমি আমায় বিশ্বাস করো। এখন আমি কি করি তাই বল দেবদা আর আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

দেবব্রত সব কথা শুনে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে রইল। তারপর লতাকে বলল — আচ্ছা লতা তোমার কি মনে হয় মতিলাল তোমার সঙ্গে কোন শঠতা করেছে?

— না গো না। সেও তোমারই মত নিষ্পাপ। তার চরিত্রের বিশুদ্ধতা দেখেই তবে আমি ওর সঙ্গে ও পথে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু তবু আমি ভাবতে পারছি না — লতা আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠে।

দেবব্রত লতার হাত ধরে বলে এখানে কাঁদে না। এস আমার ঘরে যাই। তারপর ভেবে দেখি তোমার এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি। সত্যিই বড় বিস্ময়কর ব্যাপার এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

লতা আঁচলে চোখ মুছে দেবব্রতের ঘরে এসে তার বিছানার এক ধার ঘেঁসে বসল।

দেবব্রত হাতের ড্রইং বোর্ডটাকে ও পাশের টেবিলের মাথায় রেখে দিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলল — আচ্ছা তুমি যাবার সময় সেই যে মাঠের মধ্যে অমন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে এ সম্বন্ধে তোমার কিছু মনে পড়ে?

লতার চমক লাগে। হঠাৎ তার গায়ের সমস্ত রোমগুলি কাঁটার মত হয়ে ওঠে। সামনে কাকে যেন দেখে একবার অস্ফুটে চিৎকার করে উঠে সে বিছানায় পড়ে জ্ঞান হারাল।

— কি হ'ল।

— কি হল ছোটবাবু? দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করল। একি লতা বাঈ কোথা থেকে এল এখানে। আর কি করেই বা অজ্ঞান হল? বিস্ময়ের ভান করে ব্রজেন চৌধুরী ছুটে এসে বিছানার পাশে দাঁড়ায়।

দেবব্রত শান্ত সমাহিতভাবে লতার শরীরটাকে ঠিক মত ভাবে বিছানার ওপর ধরে বলল — আপনি এখন যান দেখি দেওয়ানকাকা। ওর বড় অসুস্থ। কি দেখে ও হঠাৎ ওভাবে জ্ঞান হারাল ঠিক বুঝতে পারছি না। তবুও কতকটা অনুমান করছি — হয়ত ও এমনি একটা কিছু দেখেছে যা ওর জীবন রহস্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিহারী — এই বিহারী, শ্রীধর আঃ কোথায় যে যায় সব লোকগুলো। এই যে বিহারী চট্ করে এক গ্লাস জল আর একটা পাখা এনে দে। আর ও পাড়া থেকে রোহিনী ডাক্তারকে ডেকে আন।

বিহারী জল আর পাখা দিয়ে ডাক্তার ডাকতে চলে গেল।

ব্রজেন চৌধুরী সবটুকু না শোনা পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে

লাগল। কবে এল ও এখানে? আর অসুখই বা কি?

দেবব্রত কোন কথার উত্তর দেয় না। সে লতার মাথায় বার বার জলের ঝাপ্‌টা দেয় আর পাখার বাতাস করে।

রোহিনী বিশ্বাস এসে লতাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে মুখ ভার করে বলে সত্যিই খুব মারাত্মক। তারপর ও অন্তঃসত্ত্বা।

— অন্তঃসত্ত্বা! ব্রজেন চৌধুরী চমকে ওঠে। মুহূর্তের জন্য তার মুখে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দেয়।

দেবব্রত সেটুকু লক্ষ্য করল। তারপর ডাক্তার বিশ্বাসের দিকে ফিরে বলল — তাহলে ডাক্তারকাকা আপনি কি বলেন, এর ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা এখন কি হ'তে পারে?

তাই ত ভাবছি দেবব্রত। সত্যিই বড় সমস্যার কথা। এখানে কোন হস্‌পিট্যালও নেই যে সেখানে ভর্তি করে দেওয়া চলে।

ব্রজেন চৌধুরী বলল — ছোটবাবু আমি এসেছিলাম আপনাকে একটা খবর জানাতে। আপনাকে কাল ভোরে লায়েকপুর যেতে হবে। কর্তাবাবু বলে পাঠিয়েছেন ওখানকার সেই খালটা নিয়ে আবার গোলমাল বেধেছে। কালই জন পঞ্চাশেক লাঠিয়াল আপনার হুকুমের অপেক্ষায় থাকবে। আপনার মতামত জানতে চেয়েছেন বড়বাবু।

উত্তেজিত মস্তিষ্কে দেবব্রত চেঁচিয়ে উঠে বলল — ঠিক আছে আপনি এখন দয়া করে যান দেখি। আমি যথা সময়ে আপনাদের হুকুম তামিল করবার চেষ্টা করব।

ব্রজেন চৌধুরী একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল — আচ্ছা চলি বাবাজী।

ব্রজেন চৌধুরী চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই লতার জ্ঞান ফিরে এল। সে উদাস দৃষ্টি মেলে একবার তার ডাক্তারকাকার মুখ আর একবার দেবব্রতের মুখটা দেখতে লাগল।

— কেমন আছিস মা। কেমন বোধ হচ্ছে? রোহিনী বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন।

— ভাল। লতা উত্তর দিল।

— জল খাবি?

লতা চুপ করে রইল।

দেবব্রত কুঁজো থেকে একগ্লাস জল ঢেলে অতি সাবধানে লতার মুখে ঢেলে দিল।

দু' ঢোঁক জল খাবার পর লতা ঘাড় নেড়ে জানাল - আর না।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই লতা উঠে বসে আবার কেঁদে ফেলল। — ডাক্তারকাকা আমি মরে যাব। এ আমার কি হ'ল আমি যে কাউকে আর মুখ দেখাতে পারছি না।

— ছিঃ লতা কাঁদে না। কি হয়েছে কি। এতে লজ্জার কি আছে। আমি যখন রয়েছি তোমার কোন ভাবনা নেই। তোমার সব ব্যবস্থাই আমি করে দেব। যাতে তুমি নির্বিঘ্নে এ বিপদ কেটে উঠতে পার তার সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করে দেব। ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাস লতার মাথায় হাত রেখে আশ্বাস দিলেন।

দেবব্রত জলের গ্লাসটা টি-পয়ের ওপর বসিয়ে বলল আচ্ছা লতা তুমি হঠাৎ কি দেখে অমন অজ্ঞান হ'লে বলত? না কি এমনি মাথা ঘুরে গেছল?

লতার সারা গাটা আবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে বলল — ঠিক তেমনি একটা মুখ। ঠিক যেমন মুখ আমি সেদিন রাত্রে নৌকার মধ্যে দেখেছিলাম তেমনি। কি ভীষণ সেই ছায়ামূর্তি — আমার সমস্ত মনে পড়েছে। সেদিন রাত্রে তোমার কাছে আসছিলাম বিদায় নেব বলে। কিন্তু পথে আসতে আসতে যেন গাটা ছম্ ছম্ করতে লাগল।

— তারপর, তারপর?

— তারপর আমি তোমার এখানে এসে তোমায় দেখতে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম আবার ওই পথ দিয়ে।

— তারপর?

— যখন আমি ঐ ঘাটের কাছে বাঁশগাছ আর তেঁতুল গাছটার তলায় গেছি তখন উঃ সে কি ভীষণ একটা ছায়ামূর্তি দেখলাম। ভয়ে আমি জ্ঞান হারাই। তারপর মনে পড়ে যেন কি একটা মিষ্টি গন্ধ এসে আমার নাক চেপে ধরে।

ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাস বলেন তারপর?

— তারপর আর আমার মনে নেই। তবে এইটুকু মনে পড়ে যেন আমি কোন একটা নৌকার ছাদের তলায় ছিলাম। সেইখানেই অস্পষ্ট আলোতে সেই ভীষণ ছায়ামূর্ত্তির মুখটা দেখতে পাই। তারপর আবার আমি জ্ঞান হারাই।

দেবব্রতের মুখটা বজ্রকঠোর হয়ে উঠল। সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল কে এই পাশবিক অত্যাচারের মূলে রয়েছে। তার দুই সবল বাহুতে রক্ত যেন টগ-বগ করে ফুটতে লাগল। এ নারকীয় জানোয়ারী শক্তির যতক্ষণ না ধ্বংস হচ্ছে ততক্ষণ বুঝি তার এ তপ্ত রক্ত ঠান্ডা হবে না। দেবব্রত উঠে পুনরায় ঘরময় পায়চারী শুরু করল।

ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাস বললেন — দেবু শোনো, এখন থেকে এত উতলা হয়ো না। আমিও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ এক বিরাট চক্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে তোমাদের দু'টি জীবনকে নিয়ে। এখন ঠান্ডা মাথায় এ চক্রান্ত থেকে উদ্ধার পাবার চিন্তা করতে হবে। এ কথা নিশ্চিত যে এর সমস্ত কলঙ্কভার তোমার ঘাড়েই এসে পৌঁছবে। কিন্তু তবুও তোমাকে অতি স্থির ও ধীর মস্তিষ্কে সব সহ্য করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আর লতার জন্য ভেবো না। ওকে আজ রাত্রের মত আমি আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখব। দেওয়ানবাবু যা শুনে গেল তা যদি তোমার বাবার কানে ওঠে তবে তিনি নির্ঘাত একটা কেলেঙ্কারী না করে ছাড়বেন না। তাই ভাবছি — ।

আচ্ছা যাই হোক্ তুমি চিন্তা করো না। ওকে দেখবার ভারটা অন্ততঃ আমি নিলাম। তুমি নিজের দিকটা বাবা একটু সামলিও।

রোহিনী ডাক্তার উঠে বললেন — আয় মা লতা যাই আমরা। তোর কোন ভয় নেই, আমার কাছে থাকলে তোর ভয় কিসের।

— না ডাক্তারকাকা আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কোপাইতে ডুবে মরে আমার এ কলঙ্কের হাত থেকে নিস্কৃতি নিই। সত্যি ডাক্তারকাকা আমি এমুখ আর মাকে দেখাতে পারব না। আপনারা দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।

— পাগলী মেয়ে। নে ওঠ, ওসব কথা ভাবতে নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি তোর ফের বিয়ে দোব দেখ না। অত ভাবছিস কেন, ছেলে বয়েসে অমন ভুলচুক একটু আধটু হয়েই থাকে এই জন্যেই তখন সাবধান হয়ে চলতে বলেছিলুম। যাক্ আয়। রোহিনী ডাক্তার লতার হাত ধরে টানলেন।

লতা উঠে দেবব্রতের পায়ের ধুলো নিয়ে ডাক্তারকাকাব সঙ্গে বিদায় নিল।

দেবব্রত তখনও ঘরময় অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

বাইশ

দাবাগ্নির মত কথাটা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

ধোপাদের মেয়ে নাচতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু জমিদার বাড়ীতে এ কথাটা আরও এককাঠি রঙ চড়িয়ে উঠল।

নদীর ঘাটে মেয়েরা নাইতে নেমে আলোচনা করল ও মেয়ে নাকি এখান থেকে যাবার আগেই অনেক কিছু করে গেছ্‌ল। আর তাই বাকি সবই ত ওই জমিদারের ছেলে দেবব্রতের কান্ড। ওর সঙ্গে মেলামেশা, হাসি-ঠাট্টা যাতায়াত, ছবি আঁকা-আঁকি কত আর বলব। ছিঃ ছিঃ কানে শুনলেও পাপ। বাপ বাঈজী নিয়ে বাগানবাড়ী মাতিয়ে রেখেছিল, এবার ছেলে বিলেত ফেরৎ হয়ে ধোপার মেয়ে নিয়ে ঐ বাগানবাড়ী মাতাল।

ঘাটে কাপড় কাচতে কাচতে পাড়া-পড়শী বৌ-ঝির দল লতার মা লক্ষ্মীকে আসতে দেখে আরও বলল — ওই মা মাগীই ত আস্কারা দিয়ে পাঠিয়ে দিত মেয়েকে। আমরা ত সব ন্যাকা, কিছু বুঝি না। আরে গোপনে সব ভাল কিন্তু এবার চাপা দিবি কি করে। জমিদারের কানে কথা উঠলে তোদের কি এমনি ছেড়ে দেবে। খুব লোভ করেছিলি। চাঁদ ধরতে গেছিলি হাত বাড়িয়ে, এবার সামলাও। এমন মেয়েটা — আহা। এবার বিয়ে থা হবে কি করে তাই ভাবি।

কে একজন বলল — সবই কপাল দিদি, সব কপাল। আমার শ্বাশুড়ী বলত - কপালে নেইক ঘি ঠক্ ঠকালে হবে কি। এও ঠিক তাই। এখন মুখপুড়ী মাগীর একুলও গেল আর ওকুলও গেল। এইবার কি আর সেই সোনার চাঁদ মতিলাল এসে তোর মেয়েকে বে করবে। বলি তার সঙ্গেই বা পাঠাল কোন ভরসায়। বাগদত্তা না ছাই, ওসব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়।

কে আর একজন বলল — ধিঙ্গি মেয়েকে যেমন ট্যাঙ্গাস্ ট্যাঙ্গাস্ করতে করতে যার তার বাড়ী পাঠাত। তার ফল ফল্‌বে বৈ কি। আজকালকার সব ছেলে নয়ত। উঠতি বয়সী ছুঁড়ি দেখলে যেন নাল ঝরে। মা গো মা কি ঘেন্নার কথা। ছি-ছি।

লক্ষ্মী আর শুনতে পারে না। যা হোক করে তার হাতের কাপড়-জামাগুলো ধুয়ে নিয়ে উঠে যায়। একে তার অন্তর সব সময় পুড়ে যাচ্ছে মেয়ের এ দুরবস্থার কথা ভেবে তার ওপর আবার পাড়া-পড়শীর কটু কটাক্ষ। যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

ঘাটে উঠতি বয়সী ছুঁড়িদের মধ্যে রসিকতা তখনও চলতে থাকে। কাক

ময়ুর পুচ্ছ এঁটে ময়ুর সাজতে গেছল। এবার ঠোক্কর খেয়ে ঘরে ফিরেছে।

নাইতে নেমে সকলে — হো-হো করে হেসে ওঠে।

জমিদার অম্বিকা প্রসাদ ব্রজেন চৌধুরীকে প্রশ্ন করলেন তুমি স্বকানে শুনেছ একথা?

— আজ্ঞে স্বকানে শুনে আর স্বচক্ষে দেখে এসেছি হুজুর। আপনি বিশ্বাস করুন।

— মিথ্যা কথা। এ কখনও সম্ভব নয়। রায়বাহাদুর হুঙ্কার ছাড়লেন। কিছুক্ষণ থেমে তিনি পায়চারি বন্ধ করে আবার প্রশ্ন করলেন — রোহিনী ডাক্তার নিজে বলেছে ঐ ধোপার মেয়েটা অন্তঃসত্তা?

— আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আপনি ত তাঁকে ডেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রায়বাহাদুর আবার ঘুরে এসে একজায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন — কিন্তু ও কাজ যে ওর দ্বারাই হয়েছে এর প্রমাণ কি?

— লোকে ত সেই কথাই বলছে, ওই মেয়েটা দিনে দশবার ছোটবাবুর কাছে যেত, ছবি আঁকত, নাচত আরও কত কি।

— তুমি নিজে চোখে কখনও কিছু দেখেছ?

— আজই তো দেখলাম হুজুর।

— কি দেখেছ?

— দেখলাম সেই মেয়েটা ছোটবাবুর বিছানায় অজ্ঞান হয়ে- নাকি ঢং করে পড়ে আছে। আর ছোটবাবু তার মাথায় জল আর বাতাস দিচ্ছে। সেই দেখেই ত আর থাকতে পারলুম না, এসেই গিন্নীমাকে বললাম্।

— হুঁ, আচ্ছা তুমি যাও — ও এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

ব্রজেন চৌধুরী যে আজ্ঞে বলে বাইরে চলে যাচ্ছিল। রায়বাহাদুর আবার ডাকলেন — শোনো।

— বলুন।

— দরজাটা বন্ধ করে এস আগে।

ব্রজেন চৌধুরী ঘরের দরজাটায় খিল লাগিয়ে এসে দাঁড়াল।

— গুলি করতে পারবে?

— আজ্ঞে? ব্রজেন চৌধুরী একটা ঢোঁক গিলল।

— পারবে না, শুধুই জমিদারি সেরেস্তায় কাজ কর। আচ্ছা বেশ, কি পারবে? ঘরে আগুন লাগাতে?

ব্রজেন চৌধুরী বড় বড় চোখ তুলে রায়বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

— হ্যাঁ হ্যাঁ। আজই, যেমন করে পার যাকে দিয়ে পার ঐ ধোপাদের বাড়ী আগুন দেওয়া চাই। আগুন দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে হবে এই অবস্থায় ওই মেয়েটাকে।

একশ নয় — এক হাজার টাকা পুরস্কার দোব। কি পারবে?

ব্রজেন চৌধুরীর চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল লোভে।

— তবে আর কোন কথা নয়। কেউ যেন ঘূণাক্ষরে না জানতে পারে। খুব সাবধান। ঘরে মোটরের পেট্রল আছে। এক গ্যালন তেল নিয়ে যাবে হাতে করে, আর নিজে হাতে সব কাজ করবে। হ্যাঁ এ সবের বীজ অঙ্কুরেই বিনাশ করা ভাল। যাও আর দেরী করো না। অমন হ্যাঁ করে দেখছ কি। আর এই নাও তোমার বকশিশের অর্দ্ধেক টাকা। বাকিটা ফিরে এলে পাবে, কিন্তু খুব সাবধান।

রায়বাহাদুর ব্রজেন চৌধুরীর হাতে পাঁচশ টাকার একটি নোটের বান্ডিল ছুঁড়ে দিলেন।

ব্রজেন চৌধুরী নোটের তাড়াটা উঠিয়ে নিয়ে দরজা খুলে চলে গেল।

দুপুরে দেবব্রত এসে খেতে বসল।

মৃন্ময়ীদেবী এসে বললেন — এসব কি শুনছি খোকা?

— কি মা। দেবব্রত মুখ তুলে তাকাল।

— তোমাকে নিশ্চয়ই বলে জানাতে হবে না। পাড়া-পড়শী গাঁ-ময় এসব কি কথা? সে কি তুমি কিছুই জান না? ছিঃ এই ছিল তোমার মনে। এই তোমার বিদেশী শিক্ষার পরিণাম। খেয়ে দেয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার বাবার ইচ্ছে ও যা হবার হয়েছে, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তোমাকে এই মাসেই কমলাকে বিয়ে করতে হবে। আমি নিজে গিয়ে মেয়ে দেখে এসেছি।

দেবব্রত মুখের গ্রাস ত্যাগ করে বলল মাফ্ করো মা। আমি ত তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না। তাছাড়া আমি ত তোমাদের বলেছি বিয়ে করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আর পাড়া-পড়শী কি কানা-ঘুসো করছে এই নিয়ে মাথা

ঘামাবার অন্তত আমার দরকার নেই। যা সত্যি নয় তাকে বিশ্বাস করে মন খারাপ করা বা উতলা হওয়া মূঢ়তা।

রায়বাহাদুর দেবব্রতের গলার স্বর শুনতে পেয়ে অন্দর মহলে এসে বললেন — তোমার এত বড় অধঃপতন হয়েছে রাস্কেল। হারামজাদা ছেলে। হিল্লী দিল্লী ফরাসী ঘুরে এসে শেষ পর্যন্ত কিনা ধোপার মেয়ের প্রেমে পড়েছ। দূর হও তুমি আমার সামনে থেকে। বংশের কুলাঙ্গার কোথাকার। আবার ওই মুখ নিয়ে এবাড়ীতে খেতে আসতে তোমার এতটুকু লজ্জা করল না।

আর আজই, হ্যাঁ আজই, তুমি কমলাকে বিয়ে করবার কথা দেবে তোমার মাকে। কমলাকে তোমার মা নিজে গিয়ে দেখে এসেছে, ইচ্ছে হয় তুমিও গিয়ে দেখে আসতে পার। ও যা হবার হয়েছে। রাস্কেল উল্লুক কোথাকার —

— বাবা আপনি আমায় মাফ্ করবেন। বিয়ে আমি করতে পারব না। তাছাড়া আপনি ভুল শুনেছেন সব। ও সব —

— কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ছেলে বলে তুমি মক্কার পীর নও। গেট আউট। গেট আউট রাস্কেল। আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে। এত বড় সাহস তোমার, আমার মুখের ওপর কথা। আমি ভুল শুনেছি। — নন্‌সেন্স। রায়বাহাদুর ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত হুঙ্কার ছেড়ে হাত নেড়ে নেড়ে দেবব্রতকে এই সব বললেন।

দেবব্রত তবু কিছু বলতে গেল — আমি বলছি বাবা, আপনি একটু তদন্ত করে দেখুন। বদ্‌লোকে আমার নামে এ অপবাদ দিচ্ছে। আমার বিশ্বাস এ কাজ আমাদের দেওয়ানকাকার —

— আবার মুখের ওপর কথা, রাস্কেল এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ। যাষ্ট গেট আউট, গে-ট-আ-উ-ট আই সে। দেওয়ানকাকা অপবাদ দিচ্ছে, হীন কোথাকার। আজ থেকে এই হীনতার জন্য তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র বলে গণ্য হবে। অমন ছেলের মুখ - দর্শন করতে চাই না আমি। আমি তোমার ওপর অনেক আশা রেখেছিলাম এতদিন। কিন্তু আমার সব আশায় তুমি আজ ছাই দিয়েছ। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি সুহাসের ছেলে কৃপেশের নামে দিয়ে যাব। আর যতদিন ও নাবালক থাকবে ততদিন তোমার মা-ই হবে ওর ন্যায্য অধিকারী। যে ছেলে বাপ-মার মুখের দিকে তাকায় না, সে এ বংশের কেউ নয়। রায়বাহাদুর উন্মত্তের মত পায়চারি করে ফিরতে লাগলেন।

দেবব্রতের খাওয়া হ'ল না। সে উঠে তার মা'র পায়ে একটা নমস্কার করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল — যাচ্ছি মা। বাবা ভুল বুঝলেন বটে কিন্তু তুমি

এ ভুল বুঝো না, এ সব গুজব, মিথ্যে। কিন্তু যখন বাবা ওই গুজবটাকেই বড় করে মেনে নিলেন তখন ওদেরকে সাহায্য করবার জন্য আমিও চেষ্টা করব মা। চলি মা বিদায়।

মৃন্ময়ী মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। দেবব্রত বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝি মানদা ছুটে এসে মৃন্ময়ীদেবীকে আঁকড়ে ধরে রইল। শ্রীধর এসেছিল বাগান থেকে কি কয়েকটা তরিতরকারি দিতে। সে কর্তামায়ের এ অবস্থা দেখে ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে পাখা আর জল এনে বাতাস করতে লাগল।

অল্পকিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে মৃন্ময়ীদেবী বললেন ওগো শুনছ, খোকাকে কি তুমি সত্যি তাড়িয়ে দিলে নাকি?

— সত্যি না ত কি মিথ্যে অভিনয় করছি বলে মনে কর তুমি? রায়বাহাদুর তেমনি উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলেন। আমার আভিজাত্যে ঘা দিয়ে প্রজারা সব হাসাহাসি করবে আর আমি তা বেঁচে থেকে সহ্য করব তা কখনই হয় না। যেখান থেকে এর মূল সে মূলের উচ্ছেদই আমার চিরকালের নীতি। সেখানে স্বার্থ সম্পর্ক বা আত্মীয়তা বলে কিছুই নেই। ভাববে অমন ছেলে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে গেছে।

— ষাট্, বালাই ষাট্, ছিঃ; ওকথা আর বলো না গো, আহা ছেলেটা না খেয়ে উঠে গেল। একবার ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখলে না সত্যি কি হয়েছে।

চুপ কর গিন্নী। অমন মেয়েলী কান্না আর আমার মনকে গলাতে পারবে না। আমার যুক্তি বা কথার নড়চড় হবে না একথা নিশ্চিত জেনো। আর আজই আমি উইল করব। সরকারকে পাঠিয়েছি এ্যাড্ভোকেট মহিমবাবুকে খবর দিতে কলকাতায়।

মৃন্ময়ীদেবী নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত হয়ে খাটের হাতলটা ধরে বসে রইলেন। রায়বাহাদুর তার বৈঠকখানা ঘরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার অনতিবিলম্ব পরেই দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী অতি সংগোপনে এসে লতা বাঈয়ের ঘরের আশে পাশে ঘরের চালে বেশ করে পেট্রল ঢেলে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিল।

মুহূর্তে অগ্নির লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে কোপাই নদীর জল আর তার আশপাশের বন-জঙ্গলকে রক্তিম করে তুলল।

লক্ষ্মী চিৎকার করে কেঁদে উঠল — - ওগো কে কোথায় আছ বাঁচাও।

রক্ষা করো।

নিকটেই নদীতে একখান ছিপ নৌকায় বসে ছিল সেদিনকার সেই মাঝি। যে ব্রজেন চৌধুরীকে লতার অজ্ঞান দেহকে তুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। আগুন দেখতে পেয়ে ছুটে এসে সে আরও যা দেখল তাতে তার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে দেখল সেদিনের সেই পাষন্ড সেই ব্রজেন চৌধুরী যে তাকে একশত টাকা দেবার প্রতিজ্ঞা করেও কথা রাখেনি। সেই পেট্রলের টিন হাতে করে ঘাপটি মেরে নদীর পাড় ঘেঁষে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মাঝি রহমান আলির মাথাটায় কেমন যেন খুন চেপে গেল। এই ত সেই লোক সেদিন অমন একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে এসে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। আবার তারই বাড়ীতে আজ সে স্বহস্তে আগুন লাগিয়ে গোপনে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। উঃ কি পাষন্ড — না-না, কখনই একে সে আজ আর ছেড়ে দেবে না। সে তাকে ঐ আগুনে আজই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। তবে হবে তার পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত।

রহমান তার নৌকার হালটা মাথার ওপর তুলে দাঁড়িয়ে রইল সেই অন্ধকারে।

ব্রজেন চৌধুরী পিছু হাঁটতে হাঁটতে যখন ঠিক তার কোলের কাছে এসে পড়ল রহমান তার অব্যর্থ লক্ষ্য দিয়ে সজোরে তার মাথায় আঘাত করল।

— উঃ বাবাগো —

শুধু একটা আর্তনাদ। তারপরই সব শেষ।

রহমানের চোখ দুটো তখন চক্‌চক্ করে জ্বলছে। সে আল্লার নাম স্মরণ করে ব্রজেন চৌধুরীর পা দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে লতা বাঈয়ের ঘরের পাঁদাড়ে ফেলে দিল।

একতাল জলন্ত আগুন তৎক্ষণাৎ চাল থেকে ঘসে পড়ল এদের দু'জনের উপর। রহমান আর অগ্রসর না হয়ে দ্রুত ছিটকে সরে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। ঠিক হয়েছে এবার। তোর উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। পুড়ে মর্! পুড়ে মর প্রমাণ কর তুই সেই ব্যক্তি, যে মেয়েটার সর্বনাশ করেছে।

গ্রামের লোকেরা ছুটে এল।

দেবব্রতও ছুটে এল। সামনে এসে সে রহমানকে দেখতে পেয়ে আঁকড়ে ধরল। চিৎকার করে বলতে লাগল কে কে এ কাজ করেছ বল্, কে আগুন লাগিয়েছে তুই? রহমান?

রহমান ছোটবাবুর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা মাত্র না করে বলল — আমি না। যে করেছে সে ঐ দেখ পুড়ছে ঐ ঘরের আগুনে। চিনতে পারিস্ ও কে? তোদের দেওয়ানকাকা। হ্যাঁ-হ্যাঁ ওই আগুন দিয়েছে। আমি নিজে চোখে দেখেছি। ওই আগুন দিয়ে পালাচ্ছিল আমি তাকে ধরে ফেলেছি। আগুন দেবার কেমন মজা এবার তা বুঝছে ও, হাঃ-হাঃ-হাঃ। রহমান পাগলের মত হাসতে লাগল।

দেবব্রত রহমানকে ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ছুটল লতার সন্ধানে, লক্ষ্মীর সন্ধানে।

ডাক্তারকাকা এসে দেবব্রতের হাতখানা চেপে ধরে বললেন — ঢুকো না দেবু ওর ভেতর। কেউ নেই ওখানে। ওরা সব বেঁচে গেছে এ যাত্রা। লতা সেই থেকে আমার বাড়ীতেই আছে তবে ওর মা ছিল এখানে। লক্ষ্মীও আগুন দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। যাক্ বিপদটা খুব অল্পের ওপর দিয়েই গেল।

দেবব্রত আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। সে ডাক্তারকাকার হাত দুটো চেপে ধরে বলল — ডাক্তারকাকা আমি পেয়েছি এ নারকীকে। যে লতার এ সর্বনাশ করেছে, যে এই অগ্নিকান্ড বাঁধিয়েছে তাকে, পেয়েছি কাকা, দেখবেন আসুন, দেখবেন আসুন। দেবব্রত রোহিনী ডাক্তারের হাত দুটো ধরে টানতে লাগল।

— ওই দেখুন, ওই দেখুন ডাক্তারকাকা, দেখে চিনতে পারছেন ওর মুখখানা? কি সুন্দর ছিল এখন কি বীভৎস, কি বিকট হয়েছে একবার চেয়ে দেখুন। হ্যাঁ, ওর যোগ্য শাস্তিই ও পেয়েছে? কে চিনতে পারলেন না ত? আমাদের দেওয়ান ব্রজেন চৌধুরী। স্বহস্তে যে আজ পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে। এই দেখুন এই রহমান ওকে হাতে নাতে ধরেছে। ওই ওকে খুন করে ওই আগুনে টেনে ফেলে দিয়েছে। চমৎকার শাস্তি দিয়েছে। যা কখনও কেউ আজ পর্যন্ত দিয়েছে কি না সন্দেহ। লতাকে বলবেন তার সেই ছায়ামূর্তি ধরা পড়েছে। তার শাস্তিও সে পেয়েছে। আর না -এবার আমি যাই আমারও কর্তব্যের ছুটি।

গ্রামের লোকেরা তখনও বালতি ঘড়া ইত্যাদির সাহায্যে নদী থেকে জল তুলে আগুন নেভাতে সাহায্য করছে। কিন্তু যে সর্বগ্রাসী আগুন জ্বলতে শুরু করেছে তা ওই গরীবদের ঘরের সর্বস্ব ছাই না করা পর্যন্ত বুঝি নিভবে না।

লক্ষ্মীর কান্না বন্ধ হয়েছে। সে ওই লেলিহান আগুনের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

দেবব্রত একবার লক্ষ্মীকে দেখল। বেশ করে কি যেন একবার ভাবল,

অনু-ধ্যান করল তাকে দেখে, তার পর মুহূর্তে সে ডাক্তারকাকার কাছে ফিরে গিয়ে বলল — ডাক্তারকাকা আমিও বিদায় নিলাম আপনার কাছ থেকে। এরা সব রইল, লতা রইল দেখবেন। বাবা আজ আমায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন আমি তার ত্যাজ্য পুত্র। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি থেকে চিরবঞ্চিত। আমি চললাম্। আমার শিল্প সাধনার এমন অপমৃত্যু হবে তা জানতাম না ডাক্তারকাকা। মনে হচ্ছে এই আগুনে আমিও নিজেকে এই সবের সঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাই।

ডাক্তারকাকা অনেক করে বোঝালেন — ছিঃ দেবু পাগলামী করো না। মাথা ঠান্ডা করো, ধৈর্য ধর। তুমি না পুরুষ মানুষ, তুমি না শিক্ষিত।

দেবব্রত কেঁদে ফেলল। সবই স্বীকার করি ডাক্তারকাকা, কিন্তু অপবাদ আমি সহ্য করতে পারি না। আমি চললাম, আপনি লতাকে যদি পারেন একটু বুঝিয়ে বলবেন। আর ওর ডেলিভারী হলে-পর আমায় খবর দেবেন কলকাতায় আমার বন্ধুর ঠিকানায়। আমার আর একটা অনুরোধ — ওর ইসুকে নষ্ট করবেন না। আমি সব থেকেই ত বঞ্চিত হলাম কিন্তু আমার লতার স্নেহ থেকে যাতে কোন দিন বঞ্চিত না হই তার চিহ্ন স্বরূপ ওর ইসুটিকে আমাকে দেবেন ওকে বলে কয়ে। আমি তাকে যেমন করে পারি মানুষ করবো। আর যদি পারেন মতিলালের সঙ্গে লতার বিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। ওকে বুঝিয়ে বলবেন এটা সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। ওটা ত ওর স্বেচ্ছাকৃত কিছু নয়। ওটাতে ওর করার কিছুই ছিলনা।

ডাক্তারকাকা দেবব্রতের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন — বলবার আমার কিছু নেই দেবু, কোথা দিয়ে কেমন করে যে এসব হয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমিও যে লতাকে মন-মন এতখানি ভালবাসতে তা আমিও আগে জানতাম না। যাই হোক্ যেখানেই যাও আর থাক কখনও নিজের অনিষ্টের কথা চিন্তা করো না আর তোমার শিল্প সাধনা থেকে বিরত থেকো না। ভগবান তোমাকে এ আঘাত দিয়েছেন তার মূলে হয়ত তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। তোমার হাত দিয়ে তিনি বুঝি এবার কোন নুতনতর শিল্প সৃষ্টি করাবার উদ্দেশ্যেই এ আঘাত করেছেন। যাক্ আমি তোমার কথা রাখতে চেষ্টা করব। ভগবান তোমাকে সুখী করুন এই প্রার্থনা করি।

একদিকে বিশাল ঐশ্বর্য, তার শিল্পের সাধনাস্থল আর একদিকে তার শিল্পের উৎস মুখের বাসস্থানের জলন্ত লেলিহান শিখা ফেলে রেখে দেবব্রত গভীর অন্ধকারাচ্ছন্নময় পথে মাত্র কি কয়েকটা কাগজ হাতে করে পা বাড়াল।

রহমান এতক্ষণ ধরে সেইভাবে তাকিয়ে ছিল ব্রজেন চৌধুরীর জলন্ত মৃত

দেহটার দিকে। এক্ষণে বুঝি সেটা নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় সে আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠল — হাঃ-হাঃ-হাঃ। সব শেষ, সব শেষ হয়ে গেল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত। শান্ত কোপাই নদীর ওপারে সেই হাসির প্রতিধ্বনি উঠল — হাঃ-হাঃ-হাঃ।

তেইশ

আলিপুর চিলড্রেন্স হোমের বাস এসে রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ে একটি ছোট্ট দোকানের সামনে দাঁড়াল।

একটি ছোট্ট ফুট্ ফুটে পাঁচবছরের মেয়ে তা থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে সেই দোকানে ঢুকে ডাকল — ড্যাডি! ড্যাডি!

দেবব্রত ছবি আঁকছিল একমনে।

মঞ্জুর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলল — হ্যালো মঞ্জু — এই যে আমি এখানে, এস। তারপর ছুটি হয়ে গেল? দেবব্রত তুলিটা রেখে দু'হাত বাড়িয়ে মঞ্জুকে ডাকল।

মঞ্জু লতার অবিবাহিত বয়সের সেই মেয়ে। দেবব্রতের অনুরোধে ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাস লতার এই প্রথম সন্তানকে মেরে না ফেলে বাঁচিয়ে রেখে তাকে দেবব্রতের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু দেবব্রতের আর সে সামর্থ্য নেই যে এই একটি মাত্র ছোট্ট মেয়ের ভরণ-পোষণ লালন-পালনও করে। দেবব্রতের বন্ধু সরোজেশ মঞ্জুর সব ভার নিয়েছে সেই প্রথম থেকে। সেই দেবব্রতের বিপদে তাকে প্রকৃত বন্ধুর মত সাহায্য দিয়ে তার বাড়ীর কাছেই করে দিয়েছে এই একটি ছোট্ট-খাট্ট স্টুডিও আর তার সঙ্গে একটি মনোহারী দোকান। এই দোকানে দেবব্রত খেয়াল খুশি মত কখনও ছবি আঁকে আর কখনও বা খরিদ্দার এলে দোকানে গিয়ে এটা সেটা বিক্রী করে। মঞ্জু সরোজেশের বাড়ীতেই থাকে তবে স্কুল থেকে ফেরার পথে সে নিত্য তার ড্যাডির সঙ্গে একবার এসে দেখা করে যায়, আদর খেয়ে যায়।

দেবব্রত মঞ্জুকে কোলে নিয়ে বলল — তারপর মঞ্জুমা আজ কি খাবে বল ত? লজেন্স না বিসকিট? আজ কিন্তু ভারী সুন্দর একটা লজেন্স এনেছি।

মঞ্জু হাততালি দিয়ে হেসে বলে, আমি সেই লজেন্সটাই খাব, কই দাও না।

— এই যে দিই। দেবব্রত উঠে গিয়ে লজেন্সের প্যাকেটটা খুলে গোটা-

কতক লজেন্স বার করে মঞ্জুর হাতে দিল।

মঞ্জু লজেন্সের ওপরকার পাতলা কাগজের মোড়কটাকে খুলে মুখে দিয়ে দু'পায়ের ওপর লাফিয়ে বলল — ওঃ কি সুন্দর ড্যাডি, সত্যি খুব সুন্দর। মঞ্জু এসে আবার দেবব্রতের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দেবব্রত বসেছিল তার ছবি আঁকার বোর্ডের সামনে। মঞ্জুর হঠাৎ বোর্ডে আঁটা ছবিটার দিকে নজর পড়ল। সে বলল — ড্যাডি এটা কিসের ছবি ড্যাডি। এত আগুন কেন ? আর এটা কে দাঁড়িয়ে ড্যাডি?

দেবব্রত মঞ্জুর গালটা টিপে দিয়ে বলল — হ্যাঁ আগুন, তুমি ঠিক ধরেছ মা। আর এটা একটা মেয়ে, — ওর ঘর পুড়ে যাচ্ছে কিনা তাই ও অমন করে দাঁড়িয়ে আছে।

মঞ্জু বলল — ড্যাডি আমিও ছবি আঁকব। দাও না আমার সেই তুলিটা, কোথায় সেটা?

দেবব্রত মঞ্জুর এ খেয়ালকে প্রথম থেকেই প্রশয় দিয়ে আসছে। তার ইচ্ছা মঞ্জুকে সে এই ছোট্টবেলা থেকে ছবি আঁকা শিখিয়ে একজন বড় শিল্পী করে তুলবে। দেবব্রত বলল — মঞ্জু আজ থাক্ মা আজ আর ছবি আঁকে না বরং তুমি সেই কালকের মত নাচের ভঙ্গীতে আজ আবার একটু দাঁড়াও, আমি তোমার সেই পাথরের স্ট্যাচুটা তৈরী করি।

মঞ্জু না-না করতে লাগল।

দেবব্রত লোভ দেখিয়ে বলল — দাঁড়াও লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে আরও চারটে লজেন্স দোব।

— সত্যি?

— হ্যাঁ সত্যি।

— তবে দাও আগে।

দেবব্রত আরও চারটে লজেন্স এনে মঞ্জুর হাতে দিয়ে বলল — এইবার এসে তবে তেমনি করে দাঁড়াও চুপটি করে, এস লক্ষ্মীটি। — হ্যাঁ ঠিক আছে — লক্ষ্মী মেয়ে।

মঞ্জু এসে চুপটি করে নাচের একভঙ্গীতে দাঁড়াল। দু'-হাতে তার দুই মুদ্রা, মুখে চটুল হাসি আর চোখে দুষ্টু চাহনি।

দেবব্রত রং তুলি ত্যাগ করে এসে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে সাদা মার্বেল

পাথরটাকে খোদাই করতে থাকে।

প্রায় একঘন্টা হ'তে চলল দেবব্রতের হুঁস নেই। সে এক একবার করে মঞ্জুকে দেখে আর ছেনি দিয়ে মার্বেল পাথরের গায়ে ঠক্ ঠক্ করে আঘাত করে।

সরোজেশ এসে দাঁড়াল।

মঞ্জু ঘাড় ফিরিয়ে বলল — দেখ না আঙ্কেল, ড্যাডি আমায় সেই কতক্ষণ ধরে এমনি করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমি আর পারছি না।

দেবব্রতর হুস হ'ল। সে ছেনি হাতুড়ী রেখে দিয়ে বলল — ওঃ সত্যি ত। নাঃ তুমি এবার গিয়ে বস।

মঞ্জু গ্রীবাভঙ্গী করে অভিমানী সুরে বলে আমি আর কখনও দাঁড়াব না এতক্ষণ ধরে। আমার বুঝি কষ্ট হয় না। তুমি ভারী দুষ্টু। কই আঙ্কেল যখন ছবি আঁকে তখন ত কাউকে দাঁড়াতে বলে না। আঙ্কেল কেমন আপনি আপনি আঁকতে পারে। তোমার মত অমন দেখে দেখে না।

দেবব্রত মঞ্জুর গালটা একটু টিপে দিয়ে সরোজেশের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে, কিরে কখন এলি?

— এই ত এলাম। তারপর তোর শরীর কেমন?

— ভাল নয়। আজ আবার সেই কাশিটা বেড়েছে।

সরোজেশ দেবব্রতের হাতে একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিয়ে বলল — তোর টেলিগ্রাম। গড়পুর থেকে এসেছে।

— কই দেখি. দেখি। দেবব্রত হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটি সরোজেশের হাত থেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে পড়ল। সে কি। বাবা মারা গেছেন।

— তাই ত দেখলাম্। তোমার মা তোমায় যেতে লিখেছেন বিশেষ করে। যাও গিয়ে ভাল করে বাপের কাজকর্ম মিটিয়ে ফেল। আর এরকম করে এখানে পড়ে থেকে অভিমান দেখিয়ে কি লাভ হবে। অম্বিকাবাবু বুঝি পুত্র শোকেই দেহত্যাগ করলেন।

দেবব্রতের চোখে জল টল্ টল্ করে উঠল। সে বলল — কিন্তু সরোজেশ তুই ত সবই জানিস। বাবা যদি আমাকে এতটুকুও ক্ষমা করতেন তবে আমি নিশ্চয়ই গিয়ে দাঁড়াতাম। তিনি শুধু আমাকে তাড়িয়ে দিয়েই ত ক্ষান্ত হন নি, উকিলের চিঠি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জানালেন আমি যদি অবিলম্বে দেশে ফিরে কমলাকে বিয়ে না করি তবে আমাকে চিরকাল ত্যাজ্য পুত্র হিসেবেই থাকতে হবে,

জমিদারির কোন কিছুতে আমার ন্যায্য দাবী দাওয়া থাকবে না।

— সে ত সবই জানি। কিন্তু ও সব যা হবার তা হয়েছে, সে নিয়ে আর দুঃখ করে কি হবে বল্। এবার বরং দেশে ফিরে চল। গিয়ে সত্যিকারের পরিস্থিতিটাও একবার দেখ। তারপর যা করবার একবার চেষ্টা করে দেখব। সরোজেশ বলল।

দেবব্রত বলল মা যখন যেতে লিখেছেন যেতে আমায় হবেই। কিন্তু সরোজেশ কাজ কর্ম মিটলে আমি আবার ফিরে আসব। ও দেশের মাটিতে এমনি ভাবে দয়ার পাত্র হিসেবে আমি থাকতে পারব না। সে মা আমায় যতই বোঝান। দেবব্রত সরোজেশের হাত দুটো নিজেরে হাতের মধ্যে নিয়ে বলল আমি যত দিন বেঁচে থাকব তোর এ বন্ধুপ্রীতির কথা কখনও ভুলব না ভাই। তুই যদি না সে সময়ে আমায় সাহায্য করতিস্ তবে আমায় সত্যি পাগল হয়েই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরতে হত। দেবব্রত উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলতে বলতে ভীষণভাবে কেশে তার বুকটা চেপে ধরল। — নাঃ এ কাশিটা দেখে সত্যি এবার ভয় লাগছে সরোজেশ। এক একবার মনে হয় একটা এক্স-রে করাই কিন্তু আবার ভাবি কি হবে আর ওসব করিয়ে। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

— পাগলামি করিস নি দেবু। ও সব সেন্টিমেন্ট ছাড়। আমি টাকা দেব। তুই চল্ আমার সঙ্গে কালই একটা এক্সরে করাবি। ছিঃ তুই এখনও ঠিক তেমনি একগুঁয়েই রয়ে গেলি দেখছি।

দেবব্রত বুক থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল এখন থাক্। দেশ থেকে ফিরি, তারপর যা হয় করিস্। বাবার কাজটা আগে মিটুক। দেবব্রত হাসল।

— কবে যাবি?

— কাজ হতে ত সেই দশদিন পর? দু' একদিন হাতে থাকতেই যাব। এ ক'টা দিন এখানেই থাকি। তাছাড়া সেখানে হয়ত দু' একটা দিন দেরীও হয়ে যেতে পারে। মঞ্জুর ষ্ট্যাচুটা আর আমার এই 'আহুতির' ছবিখানা এবারকার এগজিবিশনে না পাঠিয়ে গেলে আর হয়ত ফিরে এসে সময় পাব না। এ দুটো সেরেই যাব। তারপর লতার কোন সন্ধান আর পেলি? দেবব্রত সরোজেশের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

সরোজেশ একটু ম্লান হাসল। বলল - ওর আর খবর জানতে চাস্ না। হয়ত সে ভালই আছে।

— হ্যাঁ-হ্যাঁ ভালই থাক। সুখে থাক। আহা বেচারী। অমন লোকমান্য,

যশ সব পেয়েও সব হারাল। কাগজে পড়ছিলাম অমন নাচিয়ে মেয়ে আর দু'টি ভারতে জন্মায়নি। আমার কি সখ্ যায় জানিস সরোজেশ?

— কি?

— মনে হয় মঞ্জুকে ওর মায়ের মত করে নাচ শেখাই। কিন্তু ওর যা বয়স এখন কি ওকে কোন নাচের ক্লাসে ভর্তি করা চলবে? ইচ্ছে হয় এখন থেকে ওকে নাচ শিখিয়ে ওর মায়ের অভাবটা পূরণ করি। এখন থেকেই যা নাচের দিকে ঝোঁক। হাজার হোক্ ও ত তারই মেয়ে। ও পেটে থাকতে ওর মা এই নাচেই লোকমান্য পেয়েছে। সংস্কার যদি মানতে হয় তবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওকে নাচ শেখালে ও নিশ্চয়ই নাম করবে কালে।

সরোজেশ হেসে বলল — কিন্তু তোর মঞ্জুর ত নাচের বদলে ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক বেশী দেখি। ওই দেখনা কেমন তুলি বোলাচ্ছে। এখন থেকেই যা সার্প টানগুলো দেয়, মনে হয় বুঝি বা ও তোরই সত্যিকারের মেয়ে। বাপের গুণগুলো সব পেয়েছে।

সরোজেশ কটাক্ষপাত করল।

দেবব্রত হাসল। বলল-বলে নে, বলে নে। হাতী এখন এক বাঁও কাদায় পড়ে, তখন তাকে ব্যাঙেও লাথি মারবে বৈ কি। কিন্তু ও তুই যাই বলিস্ সরোজেশ আমি যদি বেঁচে থাকি আর কয়েকটা বছর তবে ওকে আমি নিশ্চয়ই শিশু নৃত্য শিল্পী হিসেবে দেখে যাব। সত্যি ওর মুখটা দেখেই আমি অনেকটা ভুলে থাকতে পেরেছি। আচ্ছা ওর মুখটা হুবহু ওর মায়ের মত না রে? তুই ত ওর মাকে সেবার গিয়ে দেখেছিস্। মনে পড়ে না? কি আশ্চর্য সাদৃশ্য সত্যি এ যেন লতাই ছোট্টটি হয়ে আবার ফিরে এসেছে।

সরোজেশ আবার হাসল। বলল — উঠি, আর না। কই মা মঞ্জু বাড়ী যাবে না। চলো সন্ধ্যে হ'ল তোমার খাবার সময় হ'ল। তোমার আন্টি বসে আছে তোমার পথ চেয়ে।

— যাই আঙ্কেল। আর একটু দাঁড়ান। মঞ্জু রঙের প্লেটটা থেকে আর এক পোঁচ রঙ নিয়ে তার ছোট বোর্ডে আঁটা কাগজের গায়ে আবার রঙ বোলাতে লাগল।

সরোজেশ এসে জিজ্ঞাসা করল তোমার এটা কিসের ছবি হচ্ছে মঞ্জু মা?

— বারে এটা যে একটা গাছের ছবি। লাতগাছ। দেখে বুঝতে পারছ না বুঝি? কেমন সুন্দর ফুল ফুটবে এর ডালে, সেটা কাল আঁকব, তুমি দেখো কি

সুন্দর হবে তখন।

দেবব্রতের বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে—। লতা গাছ? সুন্দর ফুল ফুটবে। বাঃ চমৎকার আঁকছে ত। কিন্তু এ ছবিটা ও পেল কোথা! একি! এযে তারই হাতে আঁকা সেদিনকার সেই লতা গাছের ছবিটা। সেদিন বাগানবাড়ীতে বসে সে যেটা স্কেচ করেছিল।

সরোজেশ জিজ্ঞাসা করল — এ দু'টো কি মা মঞ্জু?

— জান না বুঝি? বাঃ এ'দুটো ত সুঁয়ো। সেই যে যাতে করে লতা গাছেরা জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে।

সরোজেশ হেসে বলল — ও-হো, বেশ, বেশ। বাঃ বেশ চমৎকার হচ্ছে। কিন্তু আজ থাক। আবার কাল হবে। এস রাত হ'ল বাড়ী যাই।

দেবব্রত সরে এসে অবাক হয়ে মঞ্জুর ছবি আঁকা দেখছিল। সে দেখছিল যে ছবিটা স্কেচ করেও শেষ করতে পারেনি সেদিন সেই স্কেচেই মঞ্জু রঙ চড়িয়েছে। ঠিক যেখানে যতটুকু এবং যেমন রঙের দরকার সেই টুকুই চড়িয়েছে। পাতাগুলো সুবজ রঙের ছোঁয়া পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর লতা গাছের সুঁয়ো দুটো কি নিখুঁত হয়েছে। বাস্তবিক ঠিক যেন দু'টি হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে শক্ত কিছু একটা। দেবব্রত অবাক হয়ে চিন্তা করল কিন্তু এত সরু তুলির টান টানতে মঞ্জু শিখল কি করে।

— কি রে তুইও যে মঞ্জুর ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলি। কি ভাবছিস্, ওটাকেও এবারকার ফাইন আর্টসের এগজিবিশনে পাঠাবি নাকি?

দেবব্রত সরে এসে একটু হাসল। বলল তাই ভাবছিলাম বটে।

মঞ্জু দেবব্রতের হাত ধরে বলল, ড্যাডি তুমি কোথা যাবে? দেশে বুঝি? আমিও যাব তোমার সঙ্গে। নিয়ে যাবে কিনা বলনা?

— আচ্ছা, আচ্ছা নিয়ে যাব। কিন্তু তুমি যাবে কি করে মা স্কুল ছেড়ে? স্কুলে যদি না তোমায় ছুটি দেয়? দেবব্রত বলল।

— কেন আঙ্কেলের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাব ফিরে এসে।

দেবব্রত হাসল। আচ্ছা তাহলে যাবে।

বাই-বাই।

সরোজেশ আর মঞ্জু দেবব্রতের দোকান ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে সামান্য পথটুকু অতিক্রম করে তার নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

দেবব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে টেলিগ্রামের কাগজটা তুলে নিয়ে আবার পড়ল — ফাদার এক্সপায়ার্ড। কাম সুন। মাদার।

চব্বিশ

স্বর্গত অম্বিকা প্রসাদের শ্রাদ্ধ শান্তি বেশ সাড়ম্বরেই মিটল।

সব কিছু কাজ কর্ম চুকতে দেবব্রত এসে মৃন্ময়ীদেবীকে বলল — মা এবার আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি কলকাতায় ফিরে যাই।

মৃন্ময়ীদেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন — খোকা এখনও তোর অভিমান গেল না। বাপ একটা ভুল করে মুখে অনেক কিছুই বলেছেন স্বীকার করি। কিন্তু তিনি ত তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে তোর শোকেই এত তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে চলে গেলেন। আমার বলবার কিছু নেই তবে এটর্নীবাবু রয়েছেন তোমার ডাক্তারকাকা রয়েছেন, এরা সবাই রয়েছেন, এঁদের মুখ থেকে শোনো তিনি তোমার কি ব্যবস্থা করে গেছেন। তারপর যা তোমার মন চায় তাই করো।

এটর্নী দ্বিজেন গাঙ্গুলী তাঁর কপাল থেকে চশমাটা চোখে নামিয়ে নিয়ে দলিল-পত্রগুলোকে সামনে টেনে নিয়ে বললেন — হ্যাঁ বাবা শোনো, আমিই বলি।

দেবব্রত একটা সোফায় চুপ করে বসল।

দ্বিজেনবাবু বলতে লাগলেন —- তোমার বাবা যদিও তোমাকে মুখে ত্যাজ্য পুত্র ইত্যাদি অনেক কিছু বলে গেছেন কিন্তু কাগজে কলমে তিনি কিছুই করে যান নি। তবে তাঁর দলিলের একটা সর্ত তোমায় মেনে নিতে হবে লিখে গেছেন।

দেবব্রত মুখ তুলে এটর্নীর দিকে তাকাল।

— আমরা অনেক খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম ধোপাদের মেয়ে লতা বাঈয়ের গর্ভে যে সন্তান প্রথম আসে তার অবিবাহিত অবস্থায় — সেটা তোমার ঔরসে জন্ম লাভ করেনি। তার সাক্ষী স্বরূপ আমরা লতা বাঈয়ের মুখ থেকে যতটা শুনেছি তাতেই আমাদের সমস্ত সংশয় চলে গেছে। যাক্ যার শাস্তি পাবার কথা ছিল, সে ভগবানের কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছে এটা শুনেছ নিশ্চয়ই।

একটু থেমে এটর্নী দ্বিজেন গাঙ্গুলী আবার বলতে লাগলেন — তোমার বাবার মনে যদিও কাঁটাটা অনেক দিন ধরে খচ্ খচ্ করেছে কিন্তু তবুও শেষকালে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে তার প্রথমকার উইল চেঞ্জ করে এই দ্বিতীয় উইল

তৈরী করে যান। হ্যাঁ যা বলছিলাম। এই উইলে তোমার বাবা যে সর্তের কথা উল্লেখ করে গেছেন সেটির প্রথম হচ্ছে তোমাকে দেশে ফিরে এসে জমিদারির সব কিছু শাসন ভার নিজে হাতে তুলে নিতে হবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সুহাস এর পিশ্বশুর শিল্পাচার্য জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মেয়ে কমলাকে তোমাকে বিয়ে করতে হবে। যদি তুমি এই দু'টি সর্তে রাজী থাক তবেই এ উইল সম্পূর্ণ ভাবে তোমাতে বলবৎ হবে। নচেৎ তুমি যেহেতু স্বর্গত রায়বাহাদুর অম্বিকা প্রসাদের একমাত্র সন্তান সেহেতু জমিদারির লভ্যাংশ থেকে কেবল মাত্র একটা মাসহারা পাবে, অবশ্য তা আজীবন। আর বাকী সমস্ত সম্পত্তি তোমার বোন সুহাসের নাবালক ছেলে কৃপেশেরে উপর বর্তাবে এবং তার তদারকির ভার হিসাবে যতদিন তোমার মা জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁরই উপর বলবৎ থাকবে। এখন তোমার যেমন মতি হয়।

ডাক্তারকাকা বললেন — বাবা দেবু, তুমি ভেবে দেখ। একদিনে না পার দু'দিন থেকে বেশ করে ভেবে একটা উত্তর দাও। তবে আমার কথা যদি মেনে নাও, তবে ও সব উইল টুইলের কথা ছেড়ে দিয়ে আমি বলব তোমার মায়ের মুখ চেয়ে তোমার এই সময় একটি বিয়ে করাই যুক্তি সঙ্গত। তাছাড়া কমলা মা ত কোন অংশে খারাপ নয়। শিল্পাচার্য জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর নিজে আসছেন তোমাকে দেখতে আর তোমার শিল্প-সাধনা দেখতে। আশা করি তোমার মত আমাদের সকলের বিপক্ষে যাবে না।

দেবব্রত উঠে দাঁড়িয়ে বলল — ডাক্তারকাকা আমাকে যদি আপনারা জমিদারির আয় আর ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে আমার সাধনা থেকে বিচ্যুত করতে চান তবে, আমি আপনাদের এ প্রস্তাবের কোনটাতেই রাজী নই। তবে মায়ের কথা বলছেন — অবশ্য সে বিষয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখি দুটো দিন।

একটু থেমে দেবব্রত বলল — কিন্তু ডাক্তারকাকা আপনি হয়ত জানেন না আমার বিয়ে করাটা আর হয়ত যুক্তি সঙ্গত হবে না। আপনারা কেউই জানেন না যে আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। কলকাতা থেকে ফেরবার পূর্বে আমি এক্সরে করিয়ে দেখেছি আমার বুকে সেই কালান্তক রোগ ঢুকেছে। বিয়ে করার হাত থেবে আপনারা আমায় অব্যাহতি দিয়ে আর যা খুশী বলুন, যতক্ষণ বেঁচে আছি তা প্রাণ দিয়ে করবার চেষ্টা করব।

এটর্নী এবং ডাক্তারকাকা তবুও বললেন ও রোগ যেমনই হোক আজকাল ও রোগে আর বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি মত দিলে আমরা প্রথমে তোমার রোগের চিকিৎসা করাব, তারপর তুমি ভাল হয়ে উঠলে তখন যা তোমার

মন হয় তাই করবে। কি আর কোন কথা আছে?

এটর্নী এবং ডাক্তারকাকা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন।

দেবব্রত তার বুকটা চেপে ধরে একবার কাশল। বলল-আপনারা যখন বলছেন তখন আর আমার বলবার কিছু নেই। তবে এ রোগ থেকে মুক্তি পেলেও মনের অতৃপ্ত বাসনা থেকে মুক্তি পাব কিনা সে সম্বন্ধে আমি এখনো সন্দিহান। আমাকে আরও দুটো দিন ভেবে দেখবার সময় দিন আপনারা।

এটর্নী দ্বিজেন গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন — বেশ ত বাবা তাই হবে। তুমি দু'টো দিন কেন দু'টো মাসও সময় নিতে পার। আর এই অবসরে তোমার রোগেরও চিকিৎসা চলতে থাকুক। সেই কথাই ভাল। কী বলুন মৃন্ময়ীদেবী?

মৃন্ময়ীদেবী ম্লান হেসে বললেন - আমি ত সেই কথাই বলেছি ওকে। খোকার রোগটা আগে সারুক তখন যা হয় ও করবে। আমার সুখ সাচ্ছন্দ আর ক'দিন তবে ও যদি এখন সে কথা না বোঝে তবে বলার আর কিছু নেই।

আচ্ছা মা আমরা তাহলে এখন উঠি। দেবব্রতবাবু কি তবে এখন এইখানেই থাকছেন ত? এটর্নী দ্বিজেন গাঙ্গুলী সোফা ত্যাগ করে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

— হ্যাঁ। আর কলকাতা গিয়েই বা কি করবে। বরং আমি বলি কি ডাক্তার পথ্য যা করবার এইখান থেকেই হোক্। মৃন্ময়ীদেবী বললেন।

দেবব্রত আর একবার কেশে বলল — মা ওসব পরে হবে কিন্তু মা আমি এখানে এই বাড়িতে থাকতে পারব না। লক্ষ্মীটি আমাকে তুমি আমার সেই বাগানবাড়ীতে থাকতে অনুমতি দাও মা। তুমিও চল না গিয়ে দিন কতক থেকে আসবে আর আমার দেখা-শোনাও করবে ও ক'দিন।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন — বেশ ত তাই হবে। তুমি ওখানেই থাকবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে তুমি যে সেই কেবল ছবি আঁকা নিয়ে পড়ে থাকবে তা চলবে না। আমি কয়েকটা দিন অবশ্য যেতে পারব না। তবে এখানকার বিশেষ ক'টা কাজ সেরে তবে তোমার ওখানে গিয়ে উঠব।

দেবব্রত হেসে বলল — তাই এসো মা। আমি তবে এখন যাই। সত্যি ওখানকার ওই ফাঁকা নদীর ধার আর শান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা থেকে আমি যেন কতকাল বঞ্চিত হয়ে আছি। দেবব্রত মৃন্ময়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে বলল আমি চলি মা। মৃন্ময়ীদেবী বললেন — আজি যাবি?

দেবব্রত চুপ করে রইল।

সেদিন দেবব্রত তার বাগানবাড়ীর সুবজ ঘাসে ভরা মাঠটিতে বসে একদৃষ্টে চেয়েছিল সেই লতাগাছটির দিকে। এই এক বছরের মধ্যে গাছটি তার পূর্ণ যৌবনে এসে পদার্পণ করেছে। ফুলে ফলে লতায় পাতায় অপরূপ রূপ ধারণ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এই সেই গাছ যেটি গেল বছর লালি এসে নিজে হাতে করে বসিয়ে গিয়েছিল এই বাগানে। দেবব্রতকে সেদিন সে এই গাছ পুঁতে বলেছিল — দেবদা, এটা আমাদের শিল্প সাধনার সাক্ষীগাছ। এটা যখন বড় হবে ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হবে তখন আমরা দু'জনে এসে এর তলায় বসব। আমি এর ফুল মাথায় গুজে এর তলায় নাচব আর তুমি আঁকবে আমার ছবি। এর মঞ্জরী দিয়ে আমি তোমার ঘর সাজিয়ে আসব তোমার ফুলদানি সাজিয়ে দিয়ে আসব, তুমি দুষ্টুমি করে বলবে কিগো লতা তোমার মঞ্জরী ফুটল? আমি বলব হ্যাঁ ফুটল। চমৎকার হবে। দেবব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই মঞ্জরীতে হাত বোলাতে লাগল।

সরোজেশ এসে দেবব্রতের পিঠে হাত রাখল।

— কে?

— আমি সরোজেশ। কি হচ্ছে কি এখানে দাঁড়িয়ে?

— আরে সরোজেশ! মঞ্জু! কি আশ্চর্য আয় আয়। তারপর মঞ্জু মা কি খবর বলো তোমার — তোমাদের আসতে যে এত দেরী হল আজ? কি হয়েছিল? দেবব্রত হাঁটু গেড়ে বসে মঞ্জুকে আদর করতে করতে প্রশ্ন করল।

মঞ্জু বলল — আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না ড্যাডি। তুমি ভারী দুষ্টু; আমাকে না নিয়ে তুমি চলে এলে কেন? একটু থেমে বলল কোথায় চলে গিয়েছিলে?

দেবব্রত হেসে বলল — সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা মঞ্জু। কিন্তু যখন এসেই পড়েছ আর রাগ করে না; লক্ষ্মীটি। একি, তোমার হাতে ওটা কি? দেখি, দেখি।

মঞ্জু দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল — দেখাব না, যাও।

— দেখি দাও। বাঃ তবে তুমি নিয়ে এলে কেন ওটা? দেবব্রত হাত পাতল।

সরোজেশ মঞ্জুকে বলল — মঞ্জুমা দাও ওটা। ওকি, ড্যাডিকে দেখাবার

জন্যই ত নিয়ে এলে, আর এখন দেখাব না বলতে আছে।

মঞ্জু সরোজেশের দিকে একবার তাকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে এগিয়ে এসে দেবব্রতের হাতে সেই কাগজটি বাড়িয়ে দিল। তারপর সে সেই লতাগাছটির কাছে গিয়ে বলল বাঃ কি সুন্দর ফুল দেখ ড্যাডি। ঠিক যেন আমার আঁকা ছবির ফুল না ড্যাডি। কি সুন্দর এর মঞ্জরী, তাই না ড্যাডি ?

সরোজেশও ঘাড় নেড়ে বলল — হ্যাঁ, খুব সুন্দর।

দেবব্রত অবাক হয়ে মঞ্জুর আঁকা ছবি দেখছিল। তারই আঁকা সেই লতা গাছের স্কেচিংয়ে মঞ্জু রঙ ফলিয়ে একেবারে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাতে আবার ফুল ধরেছে। হুবহু মিলে যাচ্ছে কিন্তু এই লতাগাছের মঞ্জরীর সঙ্গে। — কি আশ্চর্য দেখ সরোজেশ। — একি অদ্ভুত প্রতিভা, সত্যি আমি বিস্মিত হয়ে পড়ছি, কি করে মঞ্জু এই রকম মঞ্জরী আঁকল। আমি ত এ মঞ্জরীগুলো ওকে এঁকে দিই নি, তবে?

দেবব্রত মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে বলল — মঞ্জু মা আজ থেকে তোমারও নাম দিলাম মঞ্জরী, তুমি এই ফুল গাছটারই সার্থক ছবি এঁকেছ। এর অদ্ভুত রং বই ফুলের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তুমিই পারবে মা — হ্যাঁ তুমিই পারবে আমার শিল্প সাধনার বাস্তব প্রতিমূর্তি হতে। এই রকমই কিছু একটা আমি অনেক দিন ধরে আশা করে এসেছি সারা জীবন ধরে।

দেবব্রত সেই লতা গাছটা থেকে একগুচ্ছ ফুলতুলে নিয়ে মঞ্জরীর হাতে দিয়ে বলল— তোমার মা বসিয়ে গিয়েছিল এই ফুলের গাছটা। আজ তার ফুল ফুটেছে, বুঝি তোমাকেই দেবার জন্য। এস ধর তোমার মায়ের এ মহার্ঘ্য দান হাতে তুলে নাও। আর আজ থেকে তুমি আমার মঞ্জু মা নও, লতা মঞ্জরী, হ্যাঁ লতা মঞ্জরী। আমি তোমার এ সার্থক ছবিকে আজই কলকাতায় পাঠাব। আজই ফাইন আর্টস এগজিবিশনে ছবি জমা দেবার বুঝি শেষ তারিখ। সরোজেশ তুই ভাই এর একটা ব্যবস্থা কর। লক্ষ্মীটি দেরী করিস্ না। এ ছবি নির্ঘাত প্রথম পুরস্কার পাবে। দেবব্রত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কথা কইতে কইতে বুক চেপে বার বার কাশতে লাগল।

এ কাশি বুঝি আর থামবে না। দেবব্রতের মুখচোখ লাল হয়ে গেছে কাশতে কাশতে তবু এ কাশি যেন থামতে চায় না। কাশতে কাশতে বুঝি এক ঝলক রক্তও উঠল দেবব্রতের মুখ দিয়ে। দেবব্রত বিস্ময়ের সঙ্গে সে রক্তের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল — এই যে বেরিয়েছে। এতদিন যার অপেক্ষাই আমি করছিলাম। আঃ বাঁচলাম্। আমার মুক্তির দিন বুঝি ঐ আগত। সরোজেশ আর দেরী করিসনি ভাই এই নে ছবিটা ধর, এতে ছবিটার একটা নাম লিখে দে। লিখে

দে 'লতা মঞ্জরী'। আর হ্যাঁ নামটাও লিখে দে — না, না তুই না মঞ্জরী মা নিজেই লিখবে। মা মঞ্জরী তুমিই লিখে দাও ত মা এই খানে তোমার নামটা। না না মঞ্জু না, লেখ লতা মঞ্জরী। দেবব্রত সরোজেশকে মঞ্জরীর হাতে কলম এগিয়ে দিতে ইসারা করল।

মঞ্জরী তার নাম লিখে দিয়ে ছবি আর কলমটা সরোজেশের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল — ড্যাডি তোমার অসুখ করেছে শোবে চল ঘরে। এখানে রোদ উঠছে।

— হ্যাঁ এই যে যাই মা। আয় সরোজেশ। কিন্তু কি দেখছিস্ বলতো ওদিকে বারবার। সরোজেশ একটু এগিয়ে গিয়ে গেটের বাইরে থেকে লতাকে ডেকে নিয়ে এল। এস লতা আর মিছে দেরী করো না।

দেবব্রতের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। একি! লতা তুমি! তুমি ফিরে এসেছ! সত্যি!

লতা এসে গলবস্ত্র হয়ে দেবব্রতকে প্রণাম করল। বলল — হ্যাঁ দেবদা আমি। তোমার লতা। কিন্তু তোমার একি দশা করেছ দেবদা। নিজেকে এভাবে তুমি ধ্বংসের পথে কিসের জন্য টেনে এনেছ? তুমি কি তোমাকে এভাবে নষ্ট করে নিজের শিল্প সাধনাকে ধ্বংস করতে চাও?

লতা কেঁদে ফেলল।

দেবব্রত এর অর্থ বুঝল। সে সরোজেশের দিকে তাকিয়ে বলল তোর এ ঋণ আমি ভুলব না সরোজেশ। আমি সবই বুঝতে পারছি তুইই আমার লতাকে এতদিন আশ্রয় দিয়েছিলি কোথাও। আবার তুই আমাকেও আশ্রয় দিয়েছিস্। তুইই ধন্য সরোজেশ, তুইই ধন্য। আঃ, বাঁচলাম; আর আমার কোন দুঃখ নেই, কোন কষ্ট নেই। ওরে সরোজেশ এবার তুই মাকে ডাক্, এটর্নীকে ডাক্, ডাক্তারকাকাকে ডাক্। বল দেবব্রতের মত ফিরেছে। সে এবার সত্যি বাঁচতে চায়। তার এখনও অনেক কাজ বাকী। তার লতা ফিরেছে, তার মঞ্জরী ফিরেছে আর তার কি ভয়। ওদের স্নেহচ্ছায়ায় আবার আমি ফিরে পাব আমার সেই পুরনো শক্তি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফিরে পাব। দেবব্রত কাশতে কাশতে সেই লতাগাছটির তলায় লুটিয়ে পড়ল।

আবার বুঝি এক ঝলক রক্ত উঠল।

সরোজেশ আর লতা ছুটে গিয়ে দেবব্রতের বুকটা চেপে ধরল।

দেবব্রত বলল — অত কাছে আসিস্ নি সরোজেশ, এ বড় মারাত্মক

রোগ।

সরোজেশ বলল — লক্ষ্মী ভাইটি, আর তুই কথা বলিস্‌নি। এবার একটু চুপ কর। সত্যি এ তুই কি করেছিস্‌ বলত ভাবতে ভাবতে। ওরে তোর লতা তোরই আছে। ওকে আমিই এতদিন তোর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম, শুধু তুই যদি ওকে ভুলতে পারিস্‌ এই ভেবে। কিন্তু সে ত তুই পারলি না, তাই সব বুঝে তোর লতাকে আবার তোর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তোর সমস্ত সেবা যত্ন করার অধিকার থেকে আর ওকে বঞ্চিত করিস্‌ না। তুইও যেমন ওকে ভুলতে পারলিনা লতাও তোকে ভুলতে পারেনি। কিন্তু তোর এ অসুখের খবর কি করে না কি করে লতা জানতে পেরে আমাকে আর একদন্ড দেরী করতে দিল না — আজই চলে এসেছে তোকে দেখতে। নে ওঠ্‌। আমার কাঁধটা ধর, ঘরে চল্‌।

দেবব্রত বলল — একটু থাম্‌। বড় কষ্ট হচ্ছে। একটু পরে যাব। কিন্তু তুই আর দেরী করিস্‌ না। যাতে ছবিটা আজই পাঠানো যায় সে ব্যবস্থা কর। না হ'লে কিন্তু সত্যি আমি বাঁচব না। ওই ছবির পুরস্কারটাই বুঝি আমার প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। ট্রেনের সময় হয়ে এল। তুই নিজে চলে যা, আমি ঠিক বেঁচে থাকব তত দিন, যতদিন না আমার 'লতা-মঞ্জরী' প্রথম পুরস্কার পায়। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ — লতাগাছটার আকর্ষী দুটো আজ যেন ওর নাগালের মধ্যে বেশ শক্ত একটা কিছু পেয়ে আঁকড়ে ধরেছে তাই না?

সরোজেশ একবার সেই দিকে তাকিয়ে দেখল।

দেবব্রত বলল লতাগাছটা প্রথম যখন এই লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঠিক তাই কি? না জোর করে এই কাঠিটার সঙ্গে লতাগাছটাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর তাই বুঝি ও একে দিয়ে গেছে তার ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ একগুচ্ছ মঞ্জরী। কিন্তু আবার সে দু'হাত বাড়িয়ে ওপরের দিকে এগিয়ে চলেছে এই বুঝে যে যাতে ভর দিয়ে সে উপরে উঠতে চায় এটি তেমন শক্ত নয়। এ লাঠি তার ভার বহন করতে পারবে না। আজ সে নাগালের মধ্যে পেয়েছে বেশ শক্ত একটা কিছু। কি চমৎকার সৌশাদৃশ্য দেখ সরোজেশ। চমৎকার।

কি পাগলের মত বকছিস বলত। লতাগাছের ত এইটাই ধর্ম। তা নিয়ে আর ভাববার কি আছে। নে পাগলামি করিস নি ওঠ্‌। আমার দেরী হচ্ছে।

মৃন্ময়ীদেবী, ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাস, এটর্নী, সুহাস ও শিল্পাচার্য্য জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন বাগানে।

শিল্পাচার্য এসেছেন দেবব্রতকে দেখতে আরও বিশেষ করে তার শিল্প সাধনা দেখতে।

বিহারী গিয়ে খবর দিয়ে বাড়ীর সকলকে ডেকে এনেছে। ছোটবাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। কি রকম সব ভুল বকছে। আপানারা সব শিগ্গীর করে আসুন।

মৃন্ময়ীদেবী এসে দেবব্রতের মাথাটা বুকের ওপর তুলে নিয়ে বলল ও মা লতা শিগ্গির করে এক গ্লাস জল নিয়ে এস ত ওপর থেকে। আর ডাক্তারবাবু আপনি একটু ওকে ভাল করে দেখুন। সত্যি আমার যেন বড় ভয় করছে। মৃন্ময়ীদেবীর চোখ জলে টল্-টল্ করে উঠল।

শিল্পাচার্য সরোজেশের কাছ থেকে সব শুনলেন, তারপর বললেন কিন্তু এখানে এভাবে পড়ে গেল কি ভাবে?

সরোজেশ সব কথা খুলে বলল। তারপর মঞ্জুর হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে শিল্পাচার্যকে দেখাল আর ওই লতাগাছটিকেও দেখাল।

মঞ্জুর ছবি দেখে শিল্পাচার্য উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করে বললেন — আর তবে দেরী করো না বাবা, তুমি তোমার বন্ধুর এ শেষ কাজটুকুও করে ওকে শান্তি দাও। আমারও বিশ্বাস এ ছবি নিশ্চয়ই প্রথম পুরস্কার পাবে।

একটু থেমে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার বললেন — দেবব্রতের শিল্প সাধনা সম্বন্ধে আমার কেবল একটা উচ্চ ধারনাই ছিল এতদিন, আজ বাস্তব অভিজ্ঞতা হল। সত্যি নিজের চোখে শিল্প সাধনার এ হেন পীঠস্থান না দেখলে আরও বিশেষ করে আমার লতামাকে না দেখলে আমি শুধু শূন্যেই আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতাম। আজ আমিও এসব দেখে ধন্য হলাম। কিন্তু বাবা সরোজেশ তুমি আর দেরী করোনা। তুমি চলে যাও ছবিটা নিয়ে।

ডাক্তার রোহিনী বিশ্বাস বললেন কলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার আনান। যেটা অতন্ত্য দরকার। বাবা সরজেশ তুমি কলকাতা যখন যাচ্ছ ফেরার পথে একজন বড় ডাক্তারকে অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে এস।

দেবব্রতের জ্ঞান ফিরলে সে চেয়ে দেখল তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তার মা মৃন্ময়ীদেবী, ডাক্তারকাকা, বিহারী, সুহাস, এটর্নী কাকা, লতা আর মঞ্জরী মা।

ডাঃ বিশ্বাস দেবব্রতের লক্ষ্য অনুসরণ করে বললেন উনি বিশ্বভারতীর শিল্পাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমার শিল্প সাধনা দেখতে সেই শান্তিনিকেতন থেকে এখানে এসেছেন।

শিল্পাচার্য এগিয়ে এসে বললেন — বাবা দেবব্রত আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমার আসার উদ্দেশ্য আর যাই থাক্ আজ এসেছি শুধু তোমাকে দেখতে আর তোমার শিল্প সাধনা দেখতে। তোমার মনোবল ও শিল্প সৃষ্টি দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ।

একটু থেমে শিল্পচার্য আবার বললেন — আমিও শিল্পী। আমি তোমার শিল্পের যথাযোগ্য মান দিতেই এসেছি। তোমার লতাকে, তোমার মঞ্জরী মাকে দেখলাম। এ হেন দুই শিল্পীকে না দেখলে ওদের কথা না শুনলে আমার জীবন ব্যর্থই থেকে যেত। এর পরও যদি আমি তোমাকে শুধু নিজের স্বার্থের খাতিরে তোমার লতার কাছ থেকে কেড়ে নিতাম তাহলে শিল্প সাধনার অপমৃত্যু হ'ত।

আমি মিথ্যা বলি না। অমি জোর করে বলছি বাবা তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। আর একটা অনুরোধ, তুমি শিল্পী, মনের সব সংশয় দূর করে তুমি লতাকে গ্রহণ কর। আজ থেকে লতার সব ভার যে তোমাকেই নিতে হবে। তোমার মাও ত সব বুঝে শুনে হাসি মুখে ওকে গ্রহণ করেছেন। আজকাল ত এমন ঘটনা আখছারই ঘটছে। তুমি ওর মেয়েকে মেয়ের মতই করে নিতে পেরেছ যখন, তখন লতাকেই বা পারবে না কেন।

দেবব্রত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল — একটু জল দাও না মা। বড় তেষ্টা পেয়েছে।

লতা হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

মৃন্ময়ীদেবী দেবব্রতকে জল খাইয়ে আঁচলে তার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বলল — কি কষ্ট হচ্ছে রে খোকা?

— না মা, আর কোন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু সরোজেশ চলে গেলো নাকি? তাকে দেখছি না যে।

মঞ্জরী এগিয়ে এসে বলল — হ্যাঁ ড্যাডি, আঙ্কেল তোমার ছবি 'লতা মঞ্জরী' নিয়ে চলে গেছেন।

দেবব্রত মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল না মা - ওটা আমার ছবি নয়! ওটা যে তোমারই ছবি -'লতা মঞ্জরী'।

সমাপ্ত